মহিমান্বিত দিন

– আল ফাত্তাহ বিন মমতাজ দিতু

২০০৪ সালের ঘটনা। তখন ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। ওই ঈদে একাই ঈদ কাটাতে চট্টগ্রাম গেলাম। যাওয়ার সময় বাসে জায়গা না হওয়ায় একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বসতে হয়। মেয়েটি দেখতে অপরূপ রূপবতী হওয়ায় আমার খুব আনন্দিত ভাবের পাশাপাশি উদ্বেগও হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল মেয়েটি এখনই বলবে, এই ছেলেটিকে উঠিয়ে দিন।

আমাকে অবাক করে মেয়েটি আগে জিজ্ঞাসা করলো, কোথায় যাবেন।

হতবাক গলায় বললাম, চট্টগ্রাম।

মেয়েটি বললো সেও চট্টগ্রাম যাবে।

অবশেষে নেমে যখন রিকশা নিলাম দেখলাম মেয়েটিও রিকশা নিচ্ছে। মেয়েটির নাম যে জিজ্ঞাসা করবো এই বুদ্ধি আমার মাথায় এলোই না।

শেষে চাচার বাসায় গিয়ে উঠলাম। চাচাতো ভাইবোনের মধ্যে আমার একটিই চাচাতো বোন। সেও আমার সঙ্গে পড়ায় আমাদের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব। তার উপর সে আমাকে তার একটি সুন্দরী বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করে দেবে বলে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা গিয়ে তারপর চট্টগ্রাম এসেছি।

সে আমাকে নিয়ে বান্ধবীটিকে দেখাতে বের হলো। আমরা বান্ধবীটির বাসায় গেলাম। বান্ধবীটির আম্মা আমাদের বসতে দিয়ে চলে গেলেন।

বান্ধবীটি যখন এলো তখন দেখে আমি অবাক, এই তো সেই মেয়ে! যে আমার পাশে বসেছিল!

আমার চাচাতো বোন পরিচয় করিয়ে দিল, এর নাম মিথিলা।

মিথিলা বললো, আমি তোর ভাইকে চিনি। খুবই লাজুক। আমরা এক সঙ্গে ঢাকা থেকে এসেছি।

মিথিলা ভিকারুননিসা নূন–এর ছাত্রী।

মিথিলা আর আমাকে ঘোরার সুযোগ করে দিয়ে আমার চাচাতো বোন ইরিন বিদায় নেয়।

মিথিলা আমাকে পুরো চট্টগ্রাম ঘুরিয়ে দেখায় যতোদূর সম্ভব।

ঈদের দিন যখন মিথিলার বাসায় যাই তখন মিথিলা আমাকে ভালোবাসার প্রস্তাব দেয়।

মিথিলাকে বললাম, তুমি ঈদের দিনটাকে মহিমান্বিত করে তুললে।

এবারের ঈদে আমাদের ভালোবাসার বয়স এক বছর পূর্ণ হবে।

ময়মনসিংহ থেকে

আগের মতোই ঈদ । খুশি ।

হ্যা। ঈদ মানেই খুশি, আনন্দ। ঈদ মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে একটি উৎসবের নাম। নতুন জামাকাপড়, ভালো ভালো খাবার, আত্মীয়–স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া, সব মিলিয়ে এক আনন্দময় মুহূর্ত।

সবার জন্য ঈদ অবশ্য আনন্দময় নয়। কিছু কিছু পরিবারের জন্য কিছু কিছু ঘটনা কালো অধ্যায় হিসেবে রয়ে যায়। পরিবারটি যদি হয় মধ্যবিত্ত তাহলে মনের মতো আনন্দ হয় না। অনেক সীমাবদ্ধতা থাকে। আর সেই পরিবারের প্রধান যদি হন বদমেজাজী, রাগী তাহলে তো আর কথাই নেই। শুধু ঈদ কেন যে কোনো অনুষ্ঠানই হয়ে উঠতে পারে বিষাদময়। আর এমন একটি পরিবারের সদস্য আমি। সব সময় সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকতে হয়েছে। শখ করে কখনো কিছু করতে পারিনি। নিজের ইচ্ছা বলতে কিছু নেই। পরিবারের প্রধানের ইচ্ছা মাফিক চলতে হয়। তাই ঈদ এলেও অন্য সবার মতো আমাদের ঘরে আনন্দ আসে না।

যখন ছোট ছিলাম, মাত্র বুঝতে শিখেছি, তখন থেকেই দেখতাম আব্বা–মা প্রায়ই ঝগড়া করতেন। ঝগড়ার প্রধান কারণ, মা আব্বাকে সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আনার কথা বলতেন। আর এ থেকেই তাদের ঝগড়ার উৎপত্তি। তাদের এই ঝগড়ার কারণে, আমরা সব সময় ভয়ের মধ্যে থাকতাম। কখন আবার ঝগড়া লেগে যায়। এ জন্য মানসিকভাবে চিন্তায় থাকতাম। এ জন্য মনের মধ্যে সব সময় আতংক কাজ করতো।

আব্বা রাজনীতি করতেন। এ জন্য আব্বা প্রায়ই বাড়িতে থাকতেন না। মাসের বেশির ভাগ সময়ই ঢাকাতে থাকতেন। আব্বা ঢাকা আসার সময় সংসার খরচ হিসেবে মাঝে মধ্যে টাকা দিতেন। আবার কখনো টাকা না দিয়ে চলে আসতেন। আসার সময় মাকে বলতেনও না। কারণ, মাকে বললে, মা টাকা চাইবেন। আব্বা বাড়িতে আট দশ দিন পরপর আসতেন। এই সময়ের জন্য মাত্র বিশ ত্রিশ টাকা দিতেন। এটা ১৯৯০ সালের দিকের ঘটনা। তখন এই টাকা দিয়ে চলা যে কতো কষ্টকর ছিল তা অবর্ণনীয়। মা অনেক কষ্টে আমাদের নিয়ে চলতেন। মা প্রায়ই চিন্তা করতেন কিভাবে এতো অল্প টাকায় আমাদের নিয়ে চলবেন। মা বাড়িতে শাক–সবজির চাষ করতেন। এছাড়াও মা বাড়িতে অন্যান্য ছোট–খাটো কাজ করতেন। হাস–মুরগি লালন–পালন করতেন। আমি প্রায়ই অতিরিক্ত শাক–সবজি, হাস–মুরগির ডিম বাজারে বিক্রি করতাম। এভাবেই মা আমাদের সংসারের ব্যয় মেটাতেন।

আব্বা যে রাজনীতি করতেন এর পেছনে বেশি উৎসাহ ছিল আমার বড় কাকা ও কাকীর। তারা আব্বাকে বলতেন, রাজনীতি করে যা। ভাগ্য ভালো হলে অনেক বড় হতে পারবি।

কিন্তু তারা আমাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা বলতেন না। তারা বলতেন না, বাড়িতে টাকা দিয়ে যাওয়ার জন্য। তারা সব সময় আব্বার পক্ষ নিতেন। মা আব্বাকে কিছু বললে তারা মাকে চুপ থাকতে বলতেন। তারা মাকে বলতেন, তোর স্বামী অনেক বড় বড় মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করে। এটা কি কম। কিন্তু যেখানে সংসার চলে না সেখানে যে রাজনীতি বিলাসিতা তা বলতেন। আব্বা কখনো মাকে জিজ্ঞাসা করতেন না, মা কিভাবে এতো অল্প টাকায় সংসারের ব্যয় মেটান। মা অনেক অপমান সত্ত্বেও আব্বাকে রাজনীতি করতে নিষেধ করতেন।

মা বলতেন, এখন রাজনীতি বন্ধ করেন। ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া করাতে হবে। রাজনীতি করতে হলে পরে করবেন, যখন তারা বড় হবে।

কিন্তু আব্বা মায়ের কথা শুনতেন না। উল্টো রাগ করতেন। মা কখনো আব্বার কাছ থেকে একটি ভালো কথা পেয়েছেন কি না আমি দেখিনি। মা যদি আব্বাকে তার চলাফেরা সম্পর্কে কিছু বলতেন, তাহলে আব্বা বকা তো দিতেনই আবার কখনো শারীরিক নির্যাতনও করতেন। আব্বা প্রায়ই মাকে বলতেন, ভালো না লাগলে বাপের বাড়িতে চলে যেতে। মা শুধু আমাদের জন্য শত অপমান সত্ত্বেও আমাদের ছেড়ে চলে যাননি। মায়ের একটাই আশা, ছেলেমেয়ে পড়ালেখা করছে, বড় হবে, তখন আর দুঃখ–কষ্ট থাকবে না।

আমরা এতো আর্থিক অনটনের মধ্যেও কারো কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেইনি। মা কারো কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেয়াকে লজ্জার মনে করতেন। আব্বার মামার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল। মামা এলে মা তার কষ্টের কথা বলতেন। কিন্তু কখনো টাকা চাইতে দেখিনি। মা বলতেন, যদি কখনো কারো কাছ থেকে সাহায্য নেই তাহলে আমি তার কাছে দুর্বল হয়ে যাবো। এ জন্য মা অনেক কষ্ট করে হলেও নিজেই সমস্যার সমাধান করতেন।

এক ঈদের ঘটনা। ঈদের মাত্র দুই দিন আছে। কিন্তু আব্বা তখনো ঢাকা থেকে বাড়িতে আসছেন না। এদিকে ঈদের সব বাজার বাকি। আমাদের জন্য ঈদের জামা–কাপড়ও কেনা হয়নি। অবশ্য সব ঈদে জামা–কাপড় পেতাম না। পরে রাতে আব্বা এলেন। পরের দিন সকাল বেলা বাজার থেকে কি কি আনতে হবে তা মাকে জিজ্ঞাসা করলেন। এটা মনে হয় ব্যতিক্রম ছিল।

মা বললেন, তেমন কিছুই তো নেই। মা বাজারের একটি তালিকা করে দিলেন।

আব্বা দেখে রেগে গেলেন। বললেন, এতো দেখছি পুরো বাজারই নিয়ে আসতে হবে। আব্বা আর বাজারের তালিকা নিলেন না। আব্বা আমাকে তার সঙ্গে বাজারে নিলেন।

আব্বা তার পছন্দ মতো বাজার করলেন। আব্বা বাজারে যাওয়ার সময় একটা কাপড়ের ব্যানার নিয়েছিলেন। প্রথমে বুঝিনি কেন এ ব্যানার বাজারে নিচ্ছেন। যখন টেইলার্সের দোকানে গেলেন তখন বুঝলাম। এ ব্যানার দিয়ে মায়ের জন্য পেটিকোট বানানোর কথা বললেন।

এ কথা শুনে আমি তখন অনেক লজ্জা পেয়েছিলাম। এটা আমার এখনো মনে হলে লজ্জায় দুই চোখ বন্ধ হয়ে যায়। ঈদ এলে ছোট হোক বড় হোক সবারই নতুন জামা নেয়ার শখ থাকে। তবে ছোটদের শখটা মনে হয় একটু বেশিই থাকে। তাই আমিও ব্যতিক্রম ছিলাম না। কিন্তু আব্বার স্বভাবের জন্য কখনো সাহস করে বলতে পারিনি। আব্বার ইচ্ছা হলে আনতো, ইচ্ছা না হলে আনতো না। যদি কখনো নতুন কাপড় আনতো তা হলে অনেক খুশি হতাম। পছন্দ হলো কি হলো না তা নিয়ে কখনো ভাবতাম না। নতুন কাপড় পেয়েছি এতেই খুশি। এভাবেই আমাদের ঈদ কাটতো।

তবে ঈদ যে শুধু আমাদের জন্য কষ্টের ছিল তা নয়, একটু আনন্দেরও ছিল। বছরে ঈদ হয় দুইটি। এই দুইটি ঈদ ছাড়া সারা বছর আর কখনো মাংস খেতে পারতাম না। অবশ্য কোনো অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ ছাড়া। তাই মনে মনে খুশি হতাম যে, অনেক দিন পরে মাংস খেতে পারবো। তখন মাংস খাওয়াকে অনেক ভাগ্যবান মনে করতাম।

আমাদের আব্বা–মায়ের আচরণে আমরা শুধু ঘরের মধ্যেই অশান্তিতে ছিলাম না। সামাজিকভাবেও আমরা অশান্তির মধ্যে ছিলাম। যখন কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যেতাম তখন সবাই করুণার চোখে দেখতো। আমি তাদেরকে বলতে শুনতাম, তাদের বাবা–মায়ের মধ্যে মিল নেই। তাদের জন্য খুব মায়া হয়। নানীর বাড়িতে বেড়াতে গেলে নানী, খালাম্মা, মামী সবাই মা–বাবার সম্পর্কে কথা জিজ্ঞাসা করতো। তারা জিজ্ঞাসা করতেন, এখনো তোমার আব্বা, তোমার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেন?

এ ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন তারা করতেন। তারা আমাদের উপদেশ দিতেন, বড় হয়ে তোমরা তোমার মাকে কষ্ট দিও না।

এই ধরনের কথা শোনা যে কতো কষ্ট তা বলে বোঝাতে পারবো না। ঘরের মধ্যে মা–বাবার সম্পর্ক ভালো না হলে সংসারে চরম অশান্তি বিরাজ করে। এ জন্য আমি এবং আমার বড় ভাই কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে তেমন যেতাম না।

প্রতি বছরের মতো প্রকৃতির নিয়মে যথারীতি এবারও ঈদ এসে হাজির। কিন্তু আমাদের আর্থিক অবস্থা, মা–বাবার সম্পর্কের তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। অবশ্য আব্বা এতো দিনে বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে রাজনীতি থেকে ব্যর্থ হয়ে ঘরে ফিরে এসেছেন। কিন্তু তার স্বভাবের কোনো পরিবর্তন নেই। বড় ভাই এখন সংসারের দায়িত্ব পারন করেন। কিছু দিন আগে ভাইয়া সউদি আরব চলে যান। একটি কনস্ট্রাকশন ফার্মে। দেশে থাকতে একটি প্রাইভেট কম্পানিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আরো আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্যই বিদেশে যাওয়া। ভাইয়া যাওয়ার সময় কিছু ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ি। তাই ভাইয়া প্রথমে টাকা পাঠালেও আগে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে হবে।

এ কথাই মনে হয় আমার ছোট বোনের মাথায় এসেছিল। তাই সে হতাশ হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, এবারের ঈদও কি আগের মতোই করতে হবে?

নাম ঠিকানা বিহীন

anightwithu_o@yahoo.com

কালো মেঘ

– আহমদ হোসেন

১৯৬২ সালের গোড়ার দিকের কথা। আমরা তখন ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। আইয়ুব খানের কুশাসনে ইউনিভার্সিটির ছাত্রসমাজ গর্জে ওঠে। এক কথায়, আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন তুঙ্গে। ছাত্ররা হল ছাড়ার নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে।

একদিন সন্ধ্যার পর হঠাৎ খবর রটে আজ রাতে ফজলুল হক হলে পুলিশের রেইড হবে। সত্যি কথা বলতে কি, খবরটা শুনে খুবই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হয়ে পড়ি। শেষকালে কি লাল দালানের ভাত খেতে হবে?

হলের মেইন গেটে বড় তালা লাগানো হয়। দারোয়ানকে নির্দেশ দেয়া হয় যেন কোনো ক্রমেই গেটের তালা না খোলে। পালা করে কিছু ছাত্র রাতে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করে। যদি সত্যিই পুলিশ হানা দেয় তাহলে যেন সকলেই তাড়াতাড়ি জানতে পারে।

রাতে তেমন কিছু হলো না ঠিকই, কিন্তু ওই রাতে আমার মতো অনেকেই দুচোখ বন্ধ করতে পারেনি। ওই রাতকে কালরাত বললে বেশি বলা হবে না।

সকলের সে কি এক টেনশন! সকালে দেখি, হলের চারদিকে পুলিশ। খোজ নিয়ে জানতে পারি ভোরেই পুলিশ হলের চারদিকে অবস্থান নিয়েছে।

এক অজানা আতংকে সবাই স্থির। এদিকে ক্যান্টিন বন্ধ। কারণ সকাল থেকে কাউকে বাইরে যেতে দেয়া হচ্ছে না। ডাইনিং হল থেকে জানানো হলো, গতকালের কিছু বাজার করা ছিল, তাই দিয়ে কোনোক্রমে দুপুরে খাওয়া চলবে। রাত থেকে ডাইনিং একদম বন্ধ।

চারদিকে পুলিশ। দুপুরের পর খাওয়ার কিছুই পাওয়া যাবে না। সে এক দুর্বিষহ অবস্থা।

কিছু পর একটা সুখবর পাওয়া গেল, কোনো ছেলে যদি হলের বাইরে যেতে চায় তাহলে যেতে দেয়া হবে। কিন্তু সে আর হলে ফিরতে পারবে না। অর্থাৎ বাইরে থেকে কারো হলে প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষেধ।

নিজের জন্য অতো চিন্তা ছিল না। কারণ আমার বড় মামা ঢাকাতেই থাকতেন। দুশ্চিন্তা আমার রুমমেট দুজন রওশন (দর্শন) ও মিজানকে (অর্থনীতি) নিয়ে। ওদের ওই মুহূর্তে কোথাও ওঠার স্থান ছিল না। ওদের আশ্বাস দিই, আপাতত আমার মামার বাসায় তিনজন উঠবো, পরে চিন্তাভাবনা করে কিছু করা যাবে।

মিজানকে দুইটি রিকশা ডেকে আনতে বলি।

কিছুক্ষণ পর মিজান রিকশা ডেকে আনে। তার মুখের মলিন চেহারা দেখে জিজ্ঞাসা করি, কি হয়েছে?

উত্তরে সে জানায়, হলের গেটের বাইরে অবস্থানরত পুলিশের এক কর্মকর্তার সঙ্গে বেশ ঝগড়া করেছে। বাঙালি হয়ে কেন বাঙালির ছেলেদের হয়রানি করছে, সরকারের নির্দেশ কেন মেনে নিচ্ছে ইত্যাদি প্রশ্নে ওই কর্মকর্তাকে চার্জ করেছে।

উত্তরে পুলিশ কর্মকর্তা জানায়, পুলিশ প্রশাসন ও গোয়েন্দা বিভাগ থেকে প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী কিছু ছাত্রকে অ্যারেস্ট করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কাউকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না।

চিন্তা করে দেখলাম মিজানকে বাইরে পাঠানো ঠিক হয়নি। হল ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে হলের ভিপি ওয়াজেদ মিয়াকে (ফিজিক্স, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর স্বামী) অনেক খোজ করলাম, হলের কোথাও তার সন্ধান পেলাম না। এক রকম নিশ্চিত ছিলাম, পুলিশ যদি সত্যিই সত্যিই কাউকে অ্যারেস্ট করে তাহলে সতীর্থ ওয়াজেদই হবে তাদের প্রথম শিকার। ওয়াজেদ মেধাবী ছাত্র, সামনে পরীক্ষা, এই সময় অ্যারেস্ট হওয়া মানে ক্যারিয়ারে এক ভয়ানক সর্বনাশ ডেকে আনা ছাড়া আর কিছু নয়।

বেলা বারোটার দিকে ভগ্ন হৃদয়ে তিন রুমমেট এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে হল ছাড়লাম।

ওই দুঃসময়ে মামার বাসায় আমাদের সময়টা ভালোই কাটতো। তাশ খেলে, গল্প করে নিজেদের আনন্দের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করতাম।

মামার কড়া নির্দেশ ছিল যেন কয়েকদিন বাইরে একদম বের না হই।

কয়েকদিন পর রওশন ও মিজান ওদের পরিচিত লোকের মেসে চলে যায়।

ইতিমধ্যে একদিন গুলিস্তানের সামনে এক সতীর্থের সঙ্গে দেখা। খুব শঙ্কিত চিত্তে রাস্তার এক কোনায় ওকে ডেকে নিই যেন সরকারের টিকটিকি না দেখে ফেলে। তার মুখে জানতে পারলাম যে, আমাদের হল ছাড়ার রাতেই ভোরে পুলিশ হলে ঢুকে এক লিস্ট দেখে কিছু ছাত্রকে ধরে নিয়ে গেছে। এর মধ্যে ভিপি ওয়াজেদও আছে।

শেষ পর্যন্ত আমার আশংকাটা সত্যে পরিণত হলো। কবে ইউনিভার্সিটি খুলবে, বন্দি ছাত্রদের আদৌ মুক্তি দেয়া হবে কি না, পরীক্ষা সময় মতো হবে কি না ইত্যাদি প্রশ্নে মনে কোনো সান্ত্বনা পাচ্ছিলাম না।

আমরা খুবই আতংকিত হয়ে পড়েছিলাম। সবার মনে একই প্রশ্ন ঠিক সময় মতো পরীক্ষা দিয়ে ইউনিভার্সিটির পাট চুকাতে পারবো তো?

কয়েকদিন পর অবশ্য পালাক্রমে ছাত্রদেরকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং হলও খুলে দেয়া হয়। কিন্তু আমাদের আতংক কাটে না। সরকারের কখন কি নির্দেশ আসে কিছুই বলা যায় না।

তবুও ওই অবস্থা মেনে নিয়েই আমরা লেখাপড়া করেছিলাম। জীবনে অনেক সময় নানান দুশ্চিন্তা, উদ্বেগের মধ্যে কাটাতে হয়েছে সত্যিই। কিন্তু হল রেইডের আগের রাতটা একটা খারাপ স্মৃতি হয়ে থাকবে।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

বিচ্ছিন্ন

– খন্দকার হাসানুজ্জামান

ইন্টারমিডিয়েটে যখন পড়ি তখন ক্লাস সিক্সের এক ছাত্রীকে পড়াতাম। ছাত্রীর সঙ্গে আমার বেশ আন্তরিক সম্পর্ক। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

একদিন ছাত্রীটি বললো, ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পরীক্ষার সময় তাদের পরিবারের সঙ্গে একটি পরিবারের ভালো সম্পর্ক ছিল। ওই পরিবারের অনার্স পড়ুয়া একটি ছেলে পড়া দেখিয়ে দেয়ার নাম করে একদিন তাকে চুমু খায়।

তাকে বললাম, তুমি তার সঙ্গে বেশি মিশো না।

এরপর আস্তে আস্তে ছাত্রীটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশ গাঢ় হয়। ছাত্রীটি যখন নাইনে পড়ে তখনো তাকে পড়াই। কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল, তাকে আমার ভালো লাগতে শুরু করলো।

একদিন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলাম।

সে কিছু বললো না।

বেশ কিছুদিন পর সে বললো, আমাকে তার ভালো লাগে। এখন সে বিয়ে করবে না।

কিন্তু আমাকে সে প্রেমের প্রস্তাব দেয়।

তার সঙ্গে আমার প্রেম চলতে থাকে। একদিন একটি ঘটনাতে বিচলিত হয়ে পড়ি।

আমি তাকে পড়াচ্ছি।

পড়ার ফাকে আমার ছাত্রীটি আমাকে জড়িয়ে ধরে এবং আমাকে অনবরত চুমু খেতে থাকে।

এই অবস্থায় ছাত্রীটির মা দেখে ফেলে।

এরপর আমি কয়েকদিন পড়াতে যাইনি। কিছুদিন পর আমাকে খবর পাঠায়, পড়াতে যাওয়ার জন্যে।

পড়াতে যাই।

তখন ছাত্রীর মা আমাকে বললেন, যতোটুকু এগিয়েছো এর বেশি এগোবে না।

বাসায় আমার আম্মাকে সব খুলে বলি।

আম্মা বললেন, আগে চাকরি করো, তারপর বিয়ে করাবো ওই মেয়েটির সঙ্গে।

মেয়ের মায়েরও সেই কথা।

আমাদের বাসার সঙ্গে ওদের বাসার লোকের যাওয়া আসা ছিল। হঠাৎ করেই বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে ঢাকা যেতে হয়। তখন ওকে পড়ানোর জন্য একজন টিচার ঠিক করে দিতে হয়। এর মধ্যে আমি ঢাকা থেকে আসি। ওদের বাসায় যাই।

ওর আম্মা আমাদের বাসায় আসে।

আমার আম্মাও ওদের বাসায় যায়।

অনেক দিন থেকে গাজীপুরে আসিনি। এর মধ্যে ঘটনা যা ঘটার ঘটে গেছে। আমি কিছু জানি না। বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন আমাকে আলাদা করে নিয়ে বললো, আমার ছাত্রীটি আমি যে টিচার ঠিক করে দিয়েছিলাম তার সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করেছে।

তখন নিজেকে কি অসহায় মনে হয়েছে তা বলার বাইরে। খালি মনে হয়েছে, মানুষ কেন এমন হয়! অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে সে এতো দিনের সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্য আরেকজনের সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করেছে তা কি মানা যায়?

জয়দেবপুর, গাজীপুর থেকে

শ্যাম্পেইন

– লিয়াকত হোসেন

সে বছর ইওরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ শেষে কর্মস্থলে ফিরতেই ইংগারের সঙ্গে দেখা। হাসি হাসি মুখ। দেখা হওয়া মাত্র হেসে প্রশ্ন করলো, কেমন মজা হলো?

পঞ্চাশঊর্ধ ইংগার আমার সহকর্মী ও নিকটতম বসের স্ত্রী।

সামারের ছুটি এলেই কোথাও না কোথাও যাওয়ার একটা প্রোগ্রাম হয়ে যায়। সে বছরও হলো।

ঠিক হলো ফ্রান্স ঘুরে দেখার। সে সঙ্গে জার্মানি, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গ। ঠিক হলো আকাশ পথে নয়, সড়ক পথে ঘুরবো।

ইওরোপের সড়কগুলো যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। গাড়ি চালিয়ে ও চড়ে দুটোতেই আরাম। ছুটতে ছুটতে রাত হলে ক্ষতি নেই, রাস্তার ধারে মোটেলে ঘুমিয়ে নেয়া যায়। ক্লান্ত হলে ভাবনা নেই, রাস্তার ধারেই সার্ভিস স্টেশনগুলোতে বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা।

দিনক্ষণ ঘনিয়ে এলে যাত্রা শুরু হলো। বিলাস বহুল দোতালা বাস। আমরা প্রায় তেষট্টি জন যাত্রী। বাসে ড্রাইভার, হেলপার, গাইডসহ আরো কয়েকজন। রাত হলেই নির্ধারিত হোটেলে ডিনার খেয়ে বিশ্রাম আর দিন হলেই ছোটা। এভাবে ছুটতে ছুটতেই দেখা হয়ে গেল বর্ণিত দেশগুলো।

এভাবে ছুটতে ছুটতেই দেখা হয়ে গেল সকালের প্যারি, দুপুরের প্যারি, রাতের প্যারি। প্যারি অর্থাৎ প্যারিস। দেখা হলো সাজলিজে, নটর ডেম, আইফেল টাওয়ার, লুভ-এ মোনালিসা, ডিজনিল্যান্ড, বিখ্যাত স্থানগুলো।

কোনো দেশে ভ্রমণ বা বেড়াতে যাওয়ার আগে ওই দেশটি সম্পর্কে জেনে নেয়া আমার দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। তখন অচেনা স্থানগুলোকেও চেনা মনে হয়, অচেনা পথকেও পরিচিত মনে হয়। কিন্তু ফ্রান্সের উপকণ্ঠে *শ্যাম্পেইন* (Champagne) গ্রামটির কথা জানা ছিল না। শ্যাম্পেইন পানীয়র সঙ্গে পরিচিত নই বলেও হয়তো বা।

আমাদের গাইড মেয়েটি গ্রামটি সম্পর্কে দুই একবার বললেও কথাগুলো মনে বাসা বাধেনি।
ফেরার পথেই ছিল গ্রামটি। বাসটি একটানা দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার পর প্রশস্ত রাজপথের ডানদিকে বাক নিতেই দূরে গ্রামের গির্জার চূড়াটি ভেসে ওঠে। ধীরে ধীরে দৃষ্টিতে উঠে আসে পাহাড়ের কোলে থরে থরে সাজানো সবুজ আঙুর বাগিচার মাঝে ছবির মতো সুন্দর শ্যাম্পেইন গ্রামটি যেন কোনো অদৃশ্য চিত্রকরের তুলিতে আকা চোখ কেড়ে নেয়া এক পেইন্টিং।

ওই সবুজ, কালচে সবুজ আঙুর থেকেই তৈরি হয় বিখ্যাত ও লোভনীয় পানীয় *শ্যাম্পেইন*। গ্রামের নামে নাম। নামটি সম্ভবত ল্যাটিন *কাম্পানিয়া* (Campania) শব্দ থেকে উৎপত্তি। কাম্পানিয়া শব্দের অর্থ সমতলের দেশ। ষষ্ঠ শতকে কাম্পানিয়ার কথা পাওয়া যায়। শ্যাম্পেইন বর্তমান ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত প্রদেশ। দশম শতকে এই অঞ্চলটি একটি রাজনৈতিক ইউনিট হিসেবে গড়ে ওঠে। একাদশ শতাব্দীর শুরুতে এ অঞ্চল *ব্লেইস*-এর কাউন্টের করতলগত হয়। পরবর্তী একশ বছর শ্যাম্পেইন ব্লেইস-এর ওপর নির্ভরশীলতা রাখে। ১১২৫ সালে দ্বিতীয় *থিবাউট* এই বিস্তীর্ণ এলাকা বা অঞ্চলটির পুনর্গঠন করেন। ১২০০ বা ১৩০০ শতকে শ্যাম্পেইনের রাজা ষষ্ঠ ও সপ্তম লুইসের সঙ্গে ক্রমাগত বিভিন্ন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এই সংঘর্ষ মৈত্রীতে রূপ নেয় ১২৮৪ সালে শ্যাম্পেইনের জোনের উত্তরাধিকারহীন হয়ে যাওয়া এবং ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ রাজা চতুর্থ ফিলিপ-কে বিয়ে করার মাধ্যমে। জোনের পুত্র দশম লুইস ফ্রান্সের রাজা হলে শ্যাম্পেইন ফ্রান্স রাজ্যভুক্ত হয়।
দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে ফ্ল্যান্ডার্স, জার্মানি, ইটালি ও প্রভেন্স অঞ্চল এবং দেশগুলোর সংযোগস্থল ও বাণিজ্যিক মেলার স্থান হিসেবে শ্যাম্পেইনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। প্রতিবারই ছয়টি বড় বাণিজ্যিক মেলার আয়োজন করা হতো এবং প্রত্যেকটি মেলা চলতো দীর্ঘ ঊনপঞ্চাশ দিন ধরে। এই মেলাগুলোতে উত্তরের তৈরি বস্ত্র, মসল্লা অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় হতো এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আসা বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী মেলার গুরুত্ব বাড়তো। মেলায় ধারেও বেচাকেনা হতো এবং এক মেলায় কেনা জিনিসের দাম পরের মেলায়ও পরিশোধ করা যেতো। এভাবেই শ্যাম্পেইন হয়ে ওঠে ইওরোপের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র।
১৪০০ শতকে এই মেলাগুলোর গুরুত্ব কমে আসে। অন্যান্য প্রদেশের মতো ১৭৯০ সালে শ্যাম্পেইন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারালেও এ অঞ্চল থেকেই এসেছেন বিখ্যাত চিন্তাবিদ ভলটেয়ার, ডান্টন, চার্লস ডি-গল যাদের চিন্তা-দর্শন-সাহিত্য ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বৃহত্তর ফ্রান্স গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে।
প্যারিস থেকে একশ মাইল উত্তরে শ্যাম্পেইনের বিস্তৃর্ণ প্রান্তর জুড়ে উৎপাদিত আঙুর থেকেই তৈরি হয় বিখ্যাত পানীয় শ্যাম্পেইন। ১৭০০ শতকে ডম পিয়ের পেরিন (Dom Pierre Perignon. ১৬৩৮-১৭১৫) নামে একজন মঙ্ক বা সন্ন্যাসী শ্যাম্পেইন আবিস্কার করেন এবং তিনি বোতলের ছিপি বা কর্কের প্রচলন করেন। ছিপির প্রচলন আগেও ছিল তবু এর পূর্ণ রূপকার হিসেবে পিয়ের পেরিন-এর নাম করা যেতে পারে। রোমান সময় থেকে এই অঞ্চলে পানীয় তৈরি হয়ে আসছে।
খৃষ্টপূর্ব ৫৭ সালে রোমের জুলিয়াস সিজার *গাউল* বিজয় উপলক্ষে এই অঞ্চলে আসেন। ৯২ খৃস্টাব্দে সম্রাট ডমিটিয়ান এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে আঙুর উৎপাদনের আদেশ দেন। কারণ আঙুরই ছিল এ অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য এবং আঙুর থেকেই তৈরি পানীয় দীর্ঘ ২০০০ বছর ধরে শ্যাম্পেইনকে দিয়ে আসছে খ্যাতি। এ অঞ্চল থেকেই তৈরি হয় প্রতি বছর আড়াইশ মিলিয়ন বোতল পানীয়।
পানীয় বোতল বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। বোতলের আকার সাধারণ বোতলের চার ভাগের এক ভাগ। দশমিক লিটার পরিমাপের বোতলই পূর্ণ আকারের। এরপর ম্যাগনাম - দুটি পূর্ণ বোতলের সমান, *জোরোবোয়াম* - চারটি পূর্ণ বোতলের সমান, *মেথুসেলাহ* - আটটি, *সালমাঞ্জার* - বারোটি, *বালথ্যাজার* - ষোলটি, *নেবুচাদনেজার* - বিশটি এবং *সভরিন* - চৌত্রিশটি পূর্ণ বোতলের সমান।

দুই

স্বাগত তোরণ পেরিয়ে বাসটি রাস্তার পাশে এসে দাড়ালো। রাস্তাটি একে বেকে উপরে পাহাড়ের মাথায় চলে গেছে।

একে একে সবাই নামলাম। রাস্তার পাশেই শ্যাম্পেইনের স্বাক্ষর হিসেবে দাড়িয়ে আছে একটি বড় কাঠের পিপা, আঙুর নিংড়ানোর কল ইত্যাদি। দুপাশে পুরনো ধাচের বাড়ি। কোনো কোনোটির পলেস্তরা পড়ে গেছে। পাশেই ঘন সবুজ আঙুর বাগান। থরে থরে আঙুর ধরে আছে। সবুজ পাতার ফাকে থোকা থোকা আঙুর। হাত দিয়ে ছোয়া যায়। গাছগুলো উচ্চতায় দু চার তিন হাতের বেশি নয়।

পুরনো ধাচের একটি গেট পেরিয়ে আমরা ফ্যাক্টরিতে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ দ্বারে বেশ বড় একটি সবুজ কাচের বোতল ঝোলানো। আগেই খবর দেয়া ছিল। মালিক এসে ফরাশি ভাষায় স্বাগত জানালেন। হাসি হাসি মুখ। পঞ্চাশঊর্ধ পেটানো শরীর। ছোট একটি বক্তব্য রেখে আমাদের মাটির তলায় বড় একটি ঠাণ্ডা রুমে নিয়ে এলেন। বিরাট রুমটিতে থরে থরে শ্যাম্পেইনের বোতল। সারিবদ্ধভাবে সাজানো। আলো-আধারি রুম জুড়ে। আবছা আলো বোতলগুলোয় প্রতিফলিত হয়ে রুমটির উজ্জ্বলতা যেন একটু বাড়িয়ে দিয়েছে।

রুম দেখার শেষে মালিককে ঘিরে দাড়ালাম। তিনি জানালেন ফ্যাক্টরি তৈরির ইতিহাস। বংশ পরম্পরায় এখন তার ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত। বলছিলেন ফরাশি ভাষায়।

ভাষাটা আয়ত্বে না থাকলেও অসুবিধা হচ্ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে ভাষান্তর করে দিচ্ছিলেন আমাদের নারী গাইড। তিনি আবার কয়েকটি ভাষায় পারদর্শী।

এ রুমেই রয়েছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পূর্ণ শ্যাম্পেইনের বোতল। আংশিক বহু দিনের পুরনো আংশিক নতুন। বর্ণনা করলেন শ্যাম্পেইন তৈরির পদ্ধতি। অবশ্য পুরোটা নয়, যতোটুকু প্রকাশ করা যায় ঠিক ততোটুকু। এখান থেকে শ্যাম্পেইন রফতানি হয় বিশ্বের প্রধানতম কয়েকটি দেশে।

শেষে আমাদের নিয়ে গেলেন উপরের একটি রুমে। জানালার পাশে আঙুর গাছের সারি। ঘরের মাঝে বড় একটি টেবিল। টেবিলের ওপর একই আকারের প্রায় ত্রিশটি ছোট গ্লাস, হালকা হলুদ রঙয়ের শ্যাম্পেইনে ভরা। মালিক ফ্যাক্টরির পক্ষ থেকে অতিথিদের আহ্বান জানালেন স্বাদ গ্রহণের জন্য। যদিও শ্যাম্পেইনের সঙ্গে পরিচয় ছিল না তবুও এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে উপেক্ষা করা গেল না। স্বাদ নিয়ে দেখা গেল, আঙুর ফল সত্যই টক।

ফিরে এলাম নিজের শহরে। নিজের কর্মস্থলে।

কেমন মজা হলো?

ইংগার তখনো প্রশ্ন নিয়ে দাড়িয়েছিল। ভেবে পাচ্ছিলাম না কি উত্তর দেবো। যদি বলি, প্যারিসে অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাহলে প্রশ্ন আসবে, এ তেমন আর কি? নতুনত্ব নেই এই ইওরোপে। যদি বলি, জীবনের প্রথম শ্যাম্পেইনের স্বাদ নিয়েছি তাহলে হয়তো অবাকই হবে, শ্যাম্পেইন ছোয়নি এমন কেউ কি এই ইওরোপে আছে নাকি?

অনেক ভেবে বললাম, এই গ্রামে অনেক দিন থেকে ছিলেন ফরাশি সম্রাট নেপোলিয়ন।

তাতে কি হলো?

গ্রামটির নাম শ্যাম্পেইন।

তাতে কি হলো?

ওখানে আমিও গিয়েছিলাম। তাতে কি হলো?

প্রতিবারই ইংগারের একই প্রশ্ন।

বললাম, আমার নাম হোসেন। তিনটি নামের শেষ অক্ষরে কি কোনো সাদৃশ্য খুজে পাচ্ছ না?

ওহ্ গড! ইংগার বলে উঠলো।

কিছু একটা আবিষ্কারে ওর চোখ দুটি বড় হয়ে গিয়েছে। বিস্ময় না ভেঙে পা বাড়ালাম।

সুইডেন থেকে

liakathossain@stockholm.com

বিয়ে

– নুরুজ্জামান

আসিফ মোরগ পোলাও খাওয়া শেষ করে। ছোট বোন আশা এক গ্লাস ঠাণ্ডা কোক তুলে দেয় আসিফের হাতে। কোক খেয়ে আসিফ গেয়ে ওঠে *ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো* খুশির ঈদ।

ভাইয়ের গান শুনে আশার মন আনন্দে ভরে যায়।

আশা এবার এইচএসসি পাস করেছে।

আশার মাথায় একটা টোকা দিয়ে আসিফ বলে, দেখ তো আড়ংয়ের পাঞ্জাবিতে আমাকে কেমন মানিয়েছে?

আশা ভালো করে দেখে বলে, দারুণ ভাইয়া। রাত্রিআপারও পছন্দ হবে।

আসিফ হাসি হাসি মুখে ঘর থেকে বের হয়।

আসিফদের কয়েকটা বাড়ি পরেই রাত্রিদের বাড়ি। রাত্রি এবারই আসিফের সঙ্গে বিএ পাস করেছে। এতো দিন কলেজে চুটিয়ে ওরা দুজন ইটিশ–পিটিশ করেছে। এখন তাদের দেখাই হয় না। রাত্রির বাবা মসজিদের ইমাম। পরিবারের সবাই পর্দানশিন।

রাত্রিদের বাড়ির পেছনে রাত্রির রুমের জানালার সামনে দাড়িয়ে আসিফ হালকা করে শিস দিতেই রাত্রি জানালার সামনে এলো। রাত্রি ফিশ ফিশ করে বললো, ঈদ *মোবারক*।

আসিফও সেভাবেই বললো, ঈদ মোবারক।

রাত্রি ফিশ ফিশ করেই বলছে, বাসায় এখন সবাই আছে। আপা–দুলাভাইও এসেছে। ঢাকা থেকে কাল এক ছেলে আসবে আমাকে দেখতে। বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার। সরকারি চাকরি করে। পছন্দ হলে কাবিন হয়ে যাবে। যা করার কালই করতে হবে। না হলে ...

কাশির শব্দে পাশে তাকাতেই আসিফ দেখে রাত্রির বড়আপা একটু দূরে দাড়িয়ে। সঙ্গে কুকুর টমি। আপা ধরতো টমি বলতেই কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে।

আসিফ ভয়ে দেয় দৌড়।

টমি ও আপা তার পেছনে আসতে থাকে।

টমির ভয়ে আসিফ সামনের দীঘিতে লাফ দেয়। কিছুক্ষণ পর উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে আপাসহ টমি দাড়িয়ে হাসছেন।

রাগে দুঃখে লজ্জায় আসিফ ডুব দেয়।

আপা জোরে জোরে বলতে থাকেন, প্রেমের মরা বলে জলে ডোবে না। এই ছেড়া তো ডুইব্বা গেছে। টমি চল।

কুকুর নিয়ে আপা চলে যান।

আসিফ দীঘি থেকে উঠে বাড়ি চলে আসে। ভাইকে দেখে আশা হেসে গেয়ে ওঠে *ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো দুঃখের ঈদ।*

রাতে আসিফের খুব জ্বর এলো। ভাইয়ের মাথায় পানিপট্টি দিচ্ছে আশা।

আসিফ অনেক কষ্টে বললো কাল রাত্রির কাবিন হবে। খুব খারাপ লাগছে।

আসিফের চোখ দিয়ে কষ্টে জল পড়ছে। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আশার চোখেও জল এলো। আশা ভাইয়ের মাথায় হাত দিয়ে ভেজা কণ্ঠে বললো, কাল রাত্রিআপার কাবিন হবে না। দেখো আমি কি করি।

আগের রাতের পরিকল্পনা অনুসারে দুপুরে আশা খুব সুন্দর করে সাজ পোশাক, গহনা পরে রাত্রিদের বাসায় যায়।

রাত্রির বোন, মা রান্নার কাজে ব্যস্ত।

দুলাভাইয়ের সঙ্গে প্রথমে দেখা হয় আশার। কিহে পড়শি শ্যালিকা, তোমাকে তো স্বর্গের পরীর মতো লাগছে। যাও রাত্রি ঘরে সাজ করছে।

আশা মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে রাত্রির ঘরে ঢুকে গেল।

আশাকে দেখে রাত্রির চোখে জল আসে। রাত্রির চোখ টিসু দিয়ে আশা মুছিয়ে দিয়ে বললো, কাদবে না। তুমি শুধু আমার কথা শুনবে। দেখো আমি কি করি।

ছেলে, ছেলের মা, বাবা ও ফুপা, ফুপু এসেছে।

রাত্রির আপা, মা ও দুলাভাই ডাইনিং টেবিলে তাদের বসিয়ে কাচ্চি বিরিয়ানি, মিষ্টি, পানীয় পরিবেশন করে। রাত্রির পরিবারের আতিথিয়েতায় ছেলের পরিবার মুগ্ধ।

তাদের খাওয়া শেষ হতেই রাত্রির বাবা মসজিদ থেকে আসেন। তিনি সকলকে নিয়ে গেস্ট রুমে বসেন।

তাদের আলাপচারিতার মাঝে আশা ও রাত্রি দুজন ঘরে প্রবেশ করে। রাত্রি আশার শিখিয়ে দেয়া কথা অনুযায়ী একটু খুড়িয়ে ঘরে প্রবেশ করে। একটু তোতলিয়ে সালাম দেয়। চোখ দুটো নাকের মাথা বরাবর তাকিয়ে টেরা করে রাখে। রাত্রির গায়ের রঙ শ্যামলা। পাশে আশা থাকায় তা খুব বেশি মনে হচ্ছে।

এর সবই ছেলের পরিবারের দৃষ্টিতে পড়ে। ছেলের ফুপু প্রশ্ন করেন, মা, তোমার কি শরীর খারাপ?

রাত্রি মাথা নাড়ে।

আশা বলে, একটু একটু খারাপ।

ছেলের মা বলেন, ঠিক আছে, তোমরা যাও।

আশা ও রাত্রি চলে যেতেই ছেলের ফুপু রাত্রির দুলাভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, রাত্রিকে তো আমরা ছবিতেই দেখেছি। ওর সঙ্গের মেয়েটা কে?

আমাদের প্রতিবেশী আকবর সাহেবের মেয়ে। রাত্রির দুলাভাই বলে।

ছেলের মা বলেন, ঠিক আছে, আমরা পরে কথা বলবো। আজ তাহলে চলি।

অতিথি চলে যেতে সবাই বুঝে গেল রাত্রির বিয়েটা এখানে হবে না।

চমকে দেয়ার মতো ঘটনা হচ্ছে, এর পরদিনই সেই ইঞ্জিনিয়ারের পরিবার আশাদের বাসায় আসে। আশাকে আংটি পরিয়ে এক মাস পরে বিয়ের তারিখ ঠিক করে গেছে।

এদিকে রাত্রির পরিবার পড়েছে লজ্জায়। এ কথা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। রাত্রির পরিবারের নেমে এসেছে অশান্তি।

আশার বিয়ের তিন দিন আগে আশার মা ও বাবা আশার বিয়ের কার্ড এলাকাবাসীকে দিয়ে নিমন্ত্রণ দিচ্ছিলেন। রাত্রিদের বাসায়ও তারা গেলেন। রাত্রির মা কথা প্রসঙ্গে বলেই ফেললেন, আপনাদের আসিফের মতো ছেলে পেলে আমাদের রাত্রির বিয়ে দিয়ে দিতাম।

এ কথা শুনে তো আসিফের মা খুশিতে ডগমগ।

এখন আসিফ বাবার সঙ্গে ব্যবসায় যায়। এক মাস ধরে ছেলের মনটা ভার। মা বাবা সবই বোঝেন। সব খবরই রাখেন। তাদেরও ইচ্ছা ছোট মেয়ের আগে বড় ছেলের বিয়ে দেয়া।

আসিফের বাবাই বলেন, তাহলে আমরা কাল বিকেলে আসি। ভাই সাহেবকে বলবেন, যদি রাজি থাকে তো কাল আসিফ ও রাত্রির কাবিন করে ফেলবো।

উঠ ছেড়ি তোর বিয়ের মতো আশার বিয়ের একদিন আগেই আসিফের সঙ্গে রাত্রির বিয়ে হয়ে গেল এবং আসিফের মা বাবা তাদের বৌমাকে এক রকম জোর করেই সেদিন নিজ বাড়িতে নিয়ে ছেলের বাসরঘর সাজিয়ে দিলেন।

এখন আসিফ ও রাত্রি প্রতি ঈদ দুপুর এবং বিকেলটা রাত্রিদের দীঘির সামনে অর্জুন গাছের নিচে বসে ফিশফাশ করে আর মিটমিট করে হাসে।

জয়দেবপুর, গাজীপুর থেকে

অসময়

– রানা জামান

১৭ আগস্ট দেশব্যাপী বোমাবাজির দুই তিন দিন পর শায়খ আবদুর রহমানের জঙ্গি ইসলামি সংগঠন *জামা'আতুল মুজাহিদিন*–এর সদস্যদের গ্রেফতার শুরু হতেই সাধারণ দাড়ি টুপিধারীদের মাঝেও আতঙ্ক দেখা দিল। জামা'আতুল মুজাহেদিন সদস্য ভেবে সাধারণ ধর্মপ্রাণ পুরুষদেরও পুলিশ এবং র‌্যাব ধরপাকড় করছে। জামায়াত–এ–ইসলামী বাংলাদেশ এবং ইসলামী ঐক্যজোটের নেতাদের মৃদু হুমকিতেও কাজ হচ্ছে না। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে এবং দৈনিক পত্রিকাগুলোয় এই সংবাদ জেনে পরিবারের সবাই হেদায়েত হোসেনকে দাড়ি কামিয়ে ফেলতে বলেছে।

দাড়ি রাখা এবং গোফ কামিয়ে ফেলা, ছেটে রাখা রাসূল (সা.)–এর সুন্নত। পুলিশি হয়রানির ভয়ে তিনি রাসূল (সা.)–এর সুন্নত বিসর্জন দিতে কোনো মতেই রাজি নন। তাছাড়া তিনি তো শায়খ আবদুর রহমানের অনুসারী নন। এ নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হওয়ায় তিনি খারাপ মেজাজ নিয়ে ব্যাগ হাতে বাসা থেকে বের হলেন। রিকশায় উঠে বসলেন। তার কেন জানি মনে হচ্ছে রাস্তায় দাড়ি টুপিওয়ালা পুরুষের উপস্থিতি অন্যান্য দিনের চেয়ে খুবই কম। এ যেন মুক্তিযুদ্ধ সময়ের উল্টো অবস্থা।

ইনকিলাব ভবনের সামনে পুলিশের উপস্থিতি বেশ। পুলিশগুলোকে তার দিকে তাকাতেই অজান্তে বাম হাত উঠিয়ে দাড়িকে আড়াল করতে চাইলেন এবং তার হার্টবিটও বেড়ে গেল। এই সময় আরেকটি দৃশ্য দেখে তিনি রীতিমতো ভয় পেলেন।

তিনজন দাড়ি টুপিওয়ালাকে পিছমোড়ায় বেধে ইনকিলাব ভবনের ভেতর থেকে বাইরে আনা হলো। ওদেরকে টেনে ধাক্কিয়ে পুলিশ ভ্যানে তোলা হলো।

হেদায়েত হোসেন কাপা কণ্ঠে রিকশাচালককে বললেন, ভাই, তাড়াতাড়ি প্যাডল মারো।

রিকশাচালক বোমাবাজির কথা শুনলেও কারা জড়িত তা তেমন বোঝেনি। সে অবাক হয়ে বললো, *সরকার এদ্দিন পর রাজাকার ধরতাছে! এইডা একটা ভালা কাম করতাছে!*

এরা রাজাকার না। মনে হয় ১৭ আগস্টের বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ওদের ধরা হয়েছে।

হেইদিন এত্তো বোমা কারা মারলো ছার?

পত্রপত্রিকায় আসছে জামা'আতুল মুজাহিদিনের সদস্যরা বোমা মেরেছে। কয়েকজন স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

এরা সবাই মোল্লা বুঝি ছার?

জি। তুমি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে জোরে প্যাডল মারো।

তাইলে এইবার কাঠমোল্লাদের খবর আছে। আপনি ডরাইতাছেন ক্যান ছার। ও বুঝছি। আপনেরও দাড়ি টুপি আছে।

তুমি বেশি কথা বলছো। কথা না বলে রিকশা চালাও। মনে মনে বললেন, এদিক দিয়ে আর অফিসে যাওয়া–আসা ঠিক হবে না। হেদায়েত হোসেনের অফিস যাত্রাবাড়ি। তিনি অফিসে ঢুকেই থমকে গেলেন। গেটম্যান ক্লিন শেভড। তিনি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, একি সাইফুল! তোমার এই অবস্থা কেন?

সাইফুল ইসলাম প্রশান্ত হেসে বললো, দেশের অবস্থা এখন ভালো না স্যার। তাই দাড়ি কামিয়ে ফেলেছি। অবস্থা স্বাভাবিক হলে আবার রাখবো।

হেদায়েত হোসেন কিছু না বলে গম্ভীর হয়ে হাটতে শুরু করলেন। সাইফুল পেছন থেকে বললো, আপনারও দাড়ি কামিয়ে ফেলা উচিত স্যার।

হেদায়েত হোসেনের বেশ রাগ হলো। তিনি দাড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, পজিশন বুঝে কথা বলবে সাইফুল। তুমি আমাকে উপদেশ দিচ্ছ। এতো সাহস তোমার?

সাইফুল ইসলাম থমমত খেয়ে বললো, সরি স্যার। মাফ করে দেন স্যার।

আর কখনো এমন ভুল করবে না। মনে থাকে যেন কথাটা।

হেদায়েত হোসেন অফিসের ভেতরে ঢুকলেন। চেম্বারে ঢুকে চেয়ারে বসে চোখ বুজে রইলেন। মাথায় হাজারো চিন্তা। কিন্তু এখন তিনি কিছুই ভাবতে চাচ্ছেন না। ভেতর থেকে আল্লাহু আল্লাহু জপছেন। আবদুল করিমের ডাকে তাকালেন।

সে ফের বললো, এক্সইএন স্যার আপনারে ডাকছেন।

হেদায়েত হোসেন জিজ্ঞাসা করলেন, স্যার কখন এসেছেন আবদুল করিম?

আপনি চেম্বারে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আসছেন।

ও, তুমি যাও। আমি আসছি।

হেদায়েত হোসেন একবার দাড়ি খিলাল করে মাথার টুপিটা ঠিক করে নোটবই ও কলম হাতে চেম্বার থেকে বের হলেন।

নির্বাহী প্রকৌশলীর চেম্বারের সামনে যেতেই আবদুল করিম দরজা খুলে দিল।

তিনি পর্দা সামান্য সরিয়ে অনুমতি চাইলেন, ভেতরে আসতে পারি হুজুর?

নির্বাহী প্রকৌশলী শামীম আহসান হাসি মুখে বললেন, কাম ইন প্লিজ।

ধন্যবাদ হুজুর। হেদায়েত হোসেন ভেতরে ঢুকে টেবিলের পাশে চেয়ারে দাড়ালেন।

সিট ডাউন প্লিজ।

ধন্যবাদ হুজুর।

হেদায়েত হোসেন নিঃশব্দে চেয়ার সরিয়ে টান টান হয়ে বসলেন। দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে নম্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কুশলাদি ভালো তো হুজুর?

আমি ভালো আছি। কিন্তু দেশের এই অবস্থায় আপনাকে একদম চিন্তিত মনে হচ্ছে না। আসলে কি তাই?

কিছুটা চিন্তাযুক্ত আছি হুজুর।

ভেবেছিলাম আপনিও দাড়ি কামিয়ে ফেলেছেন।

এমনটা কেন ভাবলেন হুজুর?

গেটম্যান দাড়ি ফেলে দিয়েছে, দেখেছেন নিশ্চয়ই।

জি হুজুর।

অফিসের একাউন্টেন্টও দাড়ি ফেলে দিয়েছে।

ওনাকে এখনো দেখা হয়নি হুজুর।

শুধু এরা না। প্রায় মৌলানারাই দাড়ি কামিয়ে ফেলেছে। আমাদের পাড়ার মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিনও দাড়ি গোফ কামিয়ে ফেলেছে। প্রথমে ওদের দেখে বোকা বনে গিয়েছিলাম আর কি।

যারা প্রকৃত অপরাধী তারা দাড়ি গোফ কামিয়ে ফেললেও র‍্যাব বা পুলিশের হাতে ধরা পড়বেই আর যারা অপরাধী নয় তাদের দাড়ি থাকলেও কিছু হবে না, আল্লাহ তার খাস বান্দাদের অবশ্যই রক্ষা করবেন হুজুর। ইনশাআল্লাহ।

এটা আপনার আধ্যাত্মিক কথা। তবে আমার পরামর্শ হলো, এই সংকট সময়ে দাড়ি কামিয়ে ফেলাই ভালো। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার রাখবেন।

তা হয় না হুজুর। আমি কোনো দোষ করিনি হুজুর। শুধু শুধু ভয়ে ভীত হয়ে দাড়ি কামিয়ে অন্যের অপরাধটা নিজের ঘাড়ে নেবো কেন?

অ্যাজ ইউ উইশ হেদায়েত সাহেব।

আমাকে কি এ জন্যই ডেকেছেন হুজুর?

ঠিক এটা না। আরেকটা জরুরি কথা আছে।

বলুন হুজুর।

শ্যামপুর এলাকার মিটার রিডার গতকাল আপনার টেবিলে একটা ফাইল দিয়েছে।

নথিটা একবার দেখেছি হুজুর।

ওর প্রস্তাবে একমত হয়ে ফাইলটা এখনই ছেড়ে দেবেন হেদায়েত সাহেব।

নুরুল কাদের সঠিক প্রতিবেদন দেয়নি হুজুর। আমি ওভাবে নথিটা ছাড়তে পারবো না।

সঠিক রিপোর্ট দেয়নি মানে? কি বলছেন আপনি?

আমি বেশ কয়েকবার কারখানাটা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দিয়েছি। কারখানায় প্রায় দুই বছর আগে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ নেয়া হয়েছে এবং আজো মিটার নেয়নি, কোনো বিদ্যুৎ বিলও দিচ্ছে না।

আপনার কোনো রিপোর্ট অফিসে নেই হেদায়েত সাহেব।

মানে?

আপনার সব রিপোর্ট কুটি কুটি হয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে চলে গিয়েছে।

সে কি হুজুর! কেন?

আমি আমার এলাকার সব খবর জানি।

তা তো জানবেনই হুজুর। আমরাই আপনাকে জানাই।

আপনারা আমাকে জানান এবং অনেক সময় যারা অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ নেয় তারাও আমার কাছ থেকে মৌখিক অনুমতি নেয়।

বুঝলাম না হুজুর।

আনিসুল হক দুই বছর আগে আমার কাছ থেকে মৌখিক অনুমতি নিয়েই *রি-রোলিং* মিলে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ লাগিয়েছেন। সেই থেকে আমরা ওর কাছ থেকে মানথলি ভালো একটা এমাউন্ট পাচ্ছি। আপনি ফাইলটা ছেড়ে দেন হেদায়েত সাহেব। এতে আমার ইন্টারেস্ট আছে।

দুঃখিত হুজুর।

আপনার মতামত দেয়ার প্রয়োজন নেই। ডিটো মেরে ফাইল ছেড়ে দিন।

একটা মিথ্যা প্রতিবেদনে ডিটো মারতে পারবো না হুজুর।

শুনুন হেদায়েত হোসেন সাহেব। কি লাভ এই সত্যের ধবজা ধরে। মনে শান্তি আছে কোনো? আপনার ফ্যামিলিতেও কি শান্তি আছে?

আপনার ধারণা ভুল হুজুর। আমার মনে এবং পরিবারে অপার শান্তি।

শুনুন হেদায়েত সাহেব। কয়দিন পর রোজা শুরু হবে, তারপর ঈদ। পেয়াজ, লবণসহ সকল জিনিসের দাম বেড়ে আকাশ ছুবে। কিছুটা সুখ ভোগ করুন। ঈদ পার্বনে বাচ্চাদের একটু হাসতে দিন আর টাকা জমিয়ে হজ্জটা সেরে ফেলুন।

অবৈধ টাকার হজ্জ কবুল হয় না হুজুর। আমি সত্যিই দুঃখিত। এবার আসি।

তাহলে ফাইলটার কি হবে?

আমাকে বাদ দিয়ে কিছু করা যায় কি না ভেবে দেখতে পারেন হুজুর।

ঠিক আছে। আপনি যান।

আসসালামু আলাইকুম।

হেদায়েত হোসেন চলে এলেন। চেয়ারে বসে ফাইলটা কাছে টেনে নিলেন। মিটার রিডার নুরুল কাদেরের প্রতিবেদন এবং ফাইল নোট পড়ে ভ্রূ কুচকে ফাইলটি আটকে র‍্যাকে রাখতেই একাউন্টেন্ট ভেতরে ঢুকলেন। হেদায়েত হোসেন ওর দিকে তাকাতেই একাউন্টেন্ট দুই হাত দিয়ে মুখ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন।

হেদায়েত হোসেন রসহীন কণ্ঠে বললেন, সর্ব শক্তিমান আল্লাহতাআলাকে আপনি ভয় পাননি। এখন আমাকে ভয় পাচ্ছেন কেন রকিব সাহেব?

রকিবউদ্দীন লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, সরি স্যার। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই আমি ফের দাড়ি রেখে দেবো।

সেটা আপনার ইচ্ছা। এখন কেন এসেছেন বলুন।

আপনার টিএ বিলটা নিয়ে এসেছি স্যার।

অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে রকিব সাহেব। মাসের শেষে এ টাকাটা খুবই উপকারে আসবে।

বিকাল চারটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে হেদায়েত হোসেন অফিস থেকে বের হলেন। রাস্তায় নামলেই তার দাড়ির দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাত দিয়ে দাড়ি ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বাড়ি চলে এলেন। তিন তলায় উঠে দরজার সামনে দাড়িয়ে কলিংবেল টিপতে গিয়েও হাত নামিয়ে নিলেন। ভেতর থেকে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

তিনি ভ্রূ কুচকে মনে মনে বললেন, কাদছে কেন? কোনো দুর্ঘটনা? কিসের? তিনি কলিংবেল টিপে দিলেন।

ছোট মেয়ে হুমায়রা দরজা খুলে দিল। ওর দুই চোখ লাল ও ফোলা।

হেদায়েত হোসেন জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়িতে কান্নাকাটি হচ্ছে কেন? কিসের দুঃসংবাদ? তুমিও কাদছো দেখছি।

হুমায়রা একবার হেচকি টেনে বললো, আপনি ভেতরে যান আব্বাজান। আম্মাজান আপনাকে ঘটনা বলবেন।

হুমায়রার হাতে ব্যাগ দিয়ে হেদায়েত হোসেন ভেতরের দিকে এগিয়ে গেলেন। বেডরুমের বিছানায় বসে সফুরা বেগম কাদছেন। তাকে ঘিরে রাবেয়া, সদরুল, আয়েশা ও আবুল হাসান কাদছে।

হেদায়েত হোসেনকে রুমে ঢুকতে দেখে সফুরা বেগম কান্না থামিয়ে তার দিকে ছুটে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও ছুটে এলো। হুমায়রাও ব্যস্ত পায়ে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। সফুরা বেগম ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ফিরে এসেছেন। আল্লাহর কাছে হাজার হাজার শোকর।

হেদায়েত হোসেন বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেমেয়েসহ তুমি এভাবে কাদছো কেন হুমায়রার মা? কার কি হয়েছে?

আমরা আপনার জন্য কাদছি।

আমার জন্য কাদছো মানে? আমার কি হয়েছে?

১৭ তারিখের বোমাবাজির পর পুলিশ, র‍্যাব সমানে দাড়িওয়ালা পুরুষদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আপনি দাড়িটা ফেলে দেন হুমায়রার আব্বা।

হুমায়রা সঙ্গে সঙ্গে বললো, হ্যা আব্বা। আপনি দাড়িটা ফেলে দেন। আপনার জন্য আমাদের খুব ভয় করছে।

হেদায়েত হোসেনের মন থেকে আতঙ্ক ভাবটা চলে গিয়েছে। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, আল্লাহ রাসূলের ভয়ে দাড়ি রেখেছি। মানুষের ভয়ে দাড়ি কামাতে পারবো না। তোমরা এই বিষয়ে আমাকে আর একটা কথাও বলবে না। এটা আমার হুকুম।

ভয়ে তারা চুপ মেরে গেলেও ফুপিয়ে কাদতে লাগলো।

হেদায়েত হোসেন বাথরুমে ঢুকলেন। আসরের নামাজের জন্য ওজু করলেন। দুইশ গজ দূরে মসজিদ। তিনি পাচ ওয়াক্ত নামাজ এই মসজিদে আদায় করেন। নামাজ আদায় শেষে বাড়িতে ঢুকে তিনি থমকে দাড়ালেন। হার্টবিট তার বাড়তে শুরু করলো।

ড্রয়িংরুমে র‍্যাবসহ দশজন পুলিশ।

চাদপুর থেকে

স্নেহময়ী

– দিলরুবা নুসরাত নূপুর

অনেকেই বলে, *বাবাহীন পরিবার পালহীন নৌকার মতো*। কিন্তু আমি এর সঙ্গে একমত নই। বাবা মারা যাবার পর আমার মা শক্তহাতে আমাদের সংসারের হাল ধরেছেন।

মা খুব ভালো ছাত্রী ছিলেন। ক্লাস টেনে পড়ার সময় তার বিয়ে হয়। তার মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয় বড় একটি সংসারের বোঝা। কিছুদিনের মধ্যেই আমি আসি তার কোল জুড়ে।

এসএসসি পাসের পর প্রাইমারি স্কুলে চাকরি হয়। সংসার, সন্তান আর চাকরি নিয়ে মা এতো বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, তখনকার মতো পড়াশোনার ইতি টানতে হয়। তারপরও তিনি হাল ছাড়েননি। আমি যখন ফোরে পড়ি তখন তিনি এইচএসসি পাস করলেন।

খুব কম বয়সে স্বামী হারালেন মা। এক সময়ে মায়ের পৃথিবী সীমাবদ্ধ ছিল সংসার, সন্তান, চাকরির মধ্যে। কিন্তু বাবার অবর্তমানে মাকে সব ধরনের কাজ করতে হয়। মায়ের মুখের দিকে এখন আর তাকাতে পারি না। সব সময় কষ্টের ছোয়া লেগেই থাকে।

পড়াশোনার জন্য মায়ের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকতে হচ্ছে। মাঝে মধ্যে দারুণ কষ্ট হয়। ইচ্ছা করে পড়াশোনা ছেড়ে মায়ের কাছে গিয়ে থাকি।

প্রায় রাতেই মা ফোন করেন, কথা বলার আগেই কেদে ফেলেন।

বুঝি, আমার মতো মায়েরও খুব কষ্ট হয়। তার সব স্বপ্ন আমাদের দুই বোনকে ঘিরে। তিনি চান আমরা যেন ভালোভাবে পড়াশোনা করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। আমাদের দুজনকে নিয়েই এখন তার পৃথিবী।

বাবা মারা যাবার পর মা ভালোভাবে কোনো ঈদ পালন করেন না। সামাজিকতা রক্ষার্থে যতোটুকু করা প্রয়োজন ততোটুকু করেন। ঈদের দিন সকালে ঘুম ভেঙেই দেখি আমার স্নেহময়ী মায়ের করুণ মুখখানি। প্রতিটি মানুষের জীবনে ঈদ আসে নবআনন্দের বারতা নিয়ে, অথচ ওই দিন মায়ের বুক ভাসে কান্নার নোনা জলে।

বরিশাল থেকে

অপলক চোখে

– নাজির আহাম্মেদ রিজভী

বিউটি কেমন করে যে একান্তই আমার হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। আমাদের দেখা–সাক্ষাৎ খুব কম হতো। কথা হতো চিঠিতে।

একদিন রাতে তাকে খুব মনে পড়লো। আবেগের তাড়নায় তার কাছে যাবো সিদ্ধান্তটা রাতে নিয়ে নিলাম। সকালে হিম হিম ঠাণ্ডা, সূর্য দেখা যাচ্ছে না। আমার এক বন্ধু সেলিমকে সঙ্গে নিয়ে তার নিবাসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। গিয়ে দেখি সবাই সকালের তাজা ঘুমে ব্যস্ত।

কলিংবেলে চাপ দিলাম।

তার বোন বেরিয়ে এলো। দেখে সে হতবাক!

তারপর তার আম্মাকে সালাম করলাম।

বিউটি আমাকে দেখামাত্র নিরব, নিথর ও শ্বাস রুদ্ধ করে অনেকক্ষণ দাড়িয়ে রইলো।

ভেতরে গেলাম। বসেই জিজ্ঞাসা করলো কি ব্যাপার, এতো সকাল সকাল।

আর বলো না, কি যে মনে হলো, তোমাকে দেখার জন্য চলে এলাম।

আমাকে পেয়ে যেন চাদ কি সূর্য হাতে পেয়েছিল জানি না। ঠোট বাকিয়ে একটু চাপা হাসি দিয়ে বললো, কেমন আছিস?

বললাম, তুমি যেমনটি রেখেছো।

অনেক কথা হলো।

সে কানসাট বলাকা মার্কেটে টাচ কমপিউটার কোচিং সেন্টারে কোচিং করতো। আমি যে পথ দিয়ে বাড়ি আসবো, বিউটি ওই পথ দিয়ে কোচিং সেন্টারে যাবে। তাই আসার সময় দুজনে একই বাসে উঠলাম। বাসা থেকে নামার সময় আমার হাতে একটি ছোট্ট চিরকুট দিল।

চিরকুটের দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইলাম। চিরকুটটিতে লেখা–

কাল দেখা করবে কানসাটে ঠিক বারোটায়। কাউন্টারে অপেক্ষা করবো।

আমার মনে প্রশ্ন, এমন কি কথা থাকতে পারে যে কানসাট যাওয়া প্রয়োজন?

কথা মতো পরদিন বারোটায় টিকিট কাউন্টারে উপস্থিত হলাম।

সেও একটু পর কোচিং সেন্টার থেকে এলো।

তার সঙ্গে কোনো কথা না বলে হাটতে থাকলাম।

সে আমাকে অনুসরণ করলো। আমি নীরব, শান্ত, জনশূন্য স্থান চাই। তাই একটি ছোট রাস্তায় ঢুকে পড়ি।

সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আমরা কোনদিকে যাচ্ছি।

আরে ভয়ের কিছুই নেই।

আরেকটু সামনে এগিয়ে গিয়ে বললো, আরে, তুই আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?

কণ্ঠে একটু কৃত্রিম রাগ তৈরি করে বললাম, জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছি।

সে বললো, তোর মতো একজনকে জীবনে পেলে জাহান্নাম কেন, এর চেয়েও বড় কষ্টের জায়গায় যেতে প্রস্তুত।

তোর কথায় খুব খুশি হলাম। সামনে চল।

দুজনে একেবারেই নীরব।

এমন সময় সে বলে উঠলো, আমার খুব ভয় লাগছে।

বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

কোচিংয়ের স্যার অথবা চেনা কারো সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়!

আরে পাগলি, এই রাস্তায় কারো সঙ্গে দেখা হবে না।

কিন্তু বিধি বাম। হঠাৎ করে একটি মোটর সাইকেলে করে তার কলেজের মনোবিজ্ঞানের স্যার চলে আসছেন।

দুজনেই হতবাক! কি করবো বুঝতে পারছি না।

স্যার আমাদের সামনে যখন এলেন হাত উঠিয়ে সালাম দিলাম।

স্যার চলে গেলেন।
অমনি সে বললো, তুই না বললি কারো সঙ্গে দেখা হবে না।
আরে, আমি কি জানতাম স্যার এই রাস্তা দিয়ে আসছেন।
সে বললো, আমাকে যদি তোর সামনে থেকে কেউ নিয়ে যায়, তখন তুই কি করবি?
বললাম, আমার শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত তোকে রক্ষা করার চেষ্টা করবো। রক্ষা করতে গিয়ে যদি মৃত্যু হয় তবুও মাথা পেতে নেবো।
তোর কথায় সত্যিই খুশি হলাম। আর কিছুদিন পর ঈদ। তাই ঈদ কার্ড কিনবো। চল ঈদ কার্ডের দোকানে যাবো।
বিভিন্ন রকমের কার্ড দেখছি। এমন সময় আমার একমাত্র বোনের স্বামী মানে ভগ্নীপতি কার্ডের দোকানে এসে উপস্থিত। আমি হতবাক, কি করবো! কিছু না লুকিয়ে বলে ফেললাম, আমার বান্ধবী বিউটি।
আর কিছু না জানতে চেয়ে চলে গেলেন।
সে কিছু ঈদ কার্ড কিনলো।
আর বাজারে থাকলাম না। আমরা মেইন রোডের পাশে দাড়ালাম। দাড়াতেই এক বেবিচালক বলছে, ভাবী যাবেন নাকি সোনা মসজিদ।
তার কথা শুনে বিউটি লজ্জা পেয়ে গেল।
বললাম, না ভাই, সোনা মসজিদ যাবো না।
হয়তো বেবিচালক ভেবেছিল আমরা নব দম্পতি। আমরা যে জায়গায় প্রথমে দাড়ালাম জায়গাটি তেমন উপযুক্ত নয়। কি করবো এখন বুঝতে পারছি না। একটু দূরে একটি বেঞ্চ দেখতে পেলাম। বেঞ্চটির কাছে গেলাম এবং পকেট থেকে রুমাল বের করে বেঞ্চটি পরিষ্কার করলাম। তারপর দুজনে বসে পড়লাম। খুবই কাছাকাছি।
তাকে বললাম, কি জন্য ডেকেছিস।
বেঞ্চে নাক ঘষতে ঘষতে বিউটি বললো, জানিস, আমার বিয়ের কথা হচ্ছে?
আশ্চর্য হয়ে বললাম, কি? তোর বিয়ে, এ তো আনন্দের সংবাদ আর তুই কি না এতোক্ষণ চুপচাপ আছিস।
আরে না, এটা সুখের সংবাদ না।
তোর বিয়েতে আমাকে নিমন্ত্রণ দিবি না তাই তুই এই কথা বলছিস। আরে তুই নিমন্ত্রণ দিস আর না-ইবা দিস, তোর বিয়েতে উপস্থিত হবো তোকে লাল শাড়িতে কেমন মানায় দেখার জন্য শুধু।
আরে তুই যেটা ভাবছিস সেটা নয়। আবেগী কণ্ঠে বিউটি বললো, অন্য কোথায় বিয়ে দিলে আমি ...।
ওর সামনে দাড়ালাম।
বিউটি আমার চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে নিয়ে কেমন যেন করছে।
ওর হাতটা হাতের মধ্যে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে বললাম, তুমি কি সত্যিই আমাকে ...।
প্রতিউত্তরে বিউটি বললো, কেন, বিশ্বাস হয় না?
কেন জানি ওর ভালোবাসা বিশ্বাস করতে পারতাম না। ও আমাকে এতো ভালোবাসবে কেন? কি এমন আছে আমার যা অন্য কারো মাঝে নেই? আমার মাঝে ভালো লাগার মতো একটিও গুণ নেই যা সহজেই একটি মেয়েকে আকৃষ্ট করবে। হাজারো দোষ আমার মধ্যে বিদ্যমান। বিউটি তো আমার সব কিছু জানে, তারপরও ...।
বহুক্ষণ কথা বলেছিলাম তার হাত ধরে। কি যে মনে হলো, এক সময় ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা বিউটি, আমাকে কি তোর জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে?
কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

আবার বললাম, চুমু দিতে ইচ্ছা করে?

নত শিরে জবাব দিল, হু।

বললাম, বাধা কিসের?

জানি না। সংক্ষেপে বললো।

লাজ–লজ্জার বলি দিয়ে বললাম, দিই একটা?

মাথা নেড়ে জানালো, না।

ইচ্ছা করে, তাহলে না বলছিস কেন?

মানুষের সব ইচ্ছা পূরণ হয় না।

তা অবশ্যই ঠিক। কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলেই এটা করতে পারি।

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, বিউটি ওর প্রচণ্ড ইচ্ছাটাকে বুকে পাথর চাপা দিয়ে আছে। তারপরও ভাবলাম মেইন রোডের পাশে বসে আছি। অনেক যানবাহন আমাদের লক্ষ্য করছে, তাই বুঝি সে লজ্জা পাচ্ছে।

জানতে চাইলাম, ভয়, নাকি লজ্জা?

অস্ফুট স্বরে বললো, দুটোই।

ভয় আর লজ্জায় মাথা হেট করে আছে বহুক্ষণ থেকে। অনুমতি না নিয়ে, বুকে সাহস নিয়ে, বিশ্বাসকে পুজি করে একটি কাজ করে বসলাম। পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে বললাম, ভয় পাসনে, তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করবো না।

সে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। বিউটি যেতে চাইলো।

ওকে বন্ধন মুক্ত করে বললাম, যাবি, তাহলে যা।

বিউটি গেল না।

আমি জানি, সে যেতে পারবে না। কারণ সে বাসে যাবে। তখনো বাস আসেনি।

বললো, এরপর তোকে মুখ দেখাবো কিভাবে!

শুকনো ঠোটে মৃদু হেসে বললাম, এতো লজ্জা তোর!

বিউটি চুপ করে রইলো।

আমি দুই হাতে ওর মুখ আলতো করে ধরে আমার মুখের কাছে আনলাম।

ও চোখ বন্ধ করে আছে।

আমি ওর মসৃণ ঠোটে ঠোট ডুবিয়ে দিলাম। এভাবে কিছুক্ষণ। আবেগে সাপের মতো ফোস ফোস করছিল ও। এমন সময় এক রিকশাচালক আমাদের কাছে এসে বেল বাজালো। বেলের শব্দ পেয়ে দুজন দুজনকে ছাড়িয়ে নিলাম। আমরা দুজনে খুব লজ্জা পেয়ে গেলাম এবং রিকশাচালককে বিনয়ের সঙ্গে যেতে বললাম।

সে বোকার মতো হেসে চলে গেল।

বিউটি দুই হাতে মুখ ঢেকে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলো।

অস্ফুট স্বরে বললাম, রাগ করেছিস?

বিউটি না সূচক মাথা নাড়ালো।

ভয় আর লজ্জায় ও তখন বাকরুদ্ধ।

অনেকক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই। এমন সময় যে বাসটির জন্য বিউটি অপেক্ষা করছিল সে বাসটি চলে এলো।

তাকে বললাম, এই বিউটি, সোনা মসজিদের বাস চলে এসেছে, তাড়াতাড়ি ওঠ।

বিউটি উঠে দাড়ালো।

বাসটি দাড় করালাম এবং বিউটিকে অতি যত্নে বাসে উঠতে সাহায্য করলাম।

বাসটি চলে গেল। বাসটির দিকে চেয়ে রইলাম অপলক চোখে।

শিবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে

বিজয়ের গন্ধ

– মাহবুবুল ইসলাম লাভলু

মুখ ফুলানো ছমিরন ভ্রূকুটি করে। ঝিঁঝি পোকার শোরগোলও যেন মুহূর্তের স্থবিরতা মেনেছে। শুনশান নিস্তব্ধতা। সোবাহান ঘর্মাক্ত চেক শার্টটি তুলে শরীরে জড়ায়। নুইয়ে যাওয়া চুলের ডগায় পানির ফোটা ঝরছে।

পনেরো দিনের ছবি কোল জুড়ে সবাক নড়েচড়ে উঠতেই মুখ ফোটে ছমিরনের, *খা খা, মোর কইলজাডা চাবাইয়া খা। হ্যা ছাড়া আর কি দিমু।*

কি এক যন্ত্রণায় সোবাহানের পলক নাচে অনবরত, হয়তো অপরাধ বোধ থেকে সমাধান খোজে আর *মুখখান দুধের ডগায় চাইফ্যা ধর্তে পারোস না! চুক চুক কর্তাল্লেও তো কান্দে না!*

এবার বোধহয় ছমিরনের ক্রোধ সামলানো গেল না। হ্যাচকা টানে ব্লাউজবিহীন স্তনযুগল উন্মুক্ত করলো। *চাউক নাই আমনের। কিচ্ছু বোঝেন না? চাইর দিন ধইরা আজগুবি ব্যতায় ভোগতে আছি। কতোবার কইলাম, একটু ডাক্তারের ধারে লন, লগে মাইয়াডারেও দেহাই। গ্যালেন না। দিনে ইপিজেড়ে, রাইতে নাইট শিফট। টাহা কামান। ও টাহাইদ্যা অইবে কি! মাইয়াই যদি না খাইয়া থাহে। বেইন্যাকালে কইরাম, হ্যাও বুইল্লা গ্যালেন, এক প্যাকেট মিল্ক ভিটা তো আনতে পারতেন।*

সজল ছমিরন শক্ত হয়ে থাকে।

সোবাহান নিরুত্তর। শার্টের আস্তিন গুটিয়ে হাড়ি থেকে পান্তা ভাত তোলে। ঠাণ্ডা ডিম ভাজা অর্ধেক করে ছমিরনের জন্য আলাদা খাবার গুছিয়ে তক্তপোষে রাখে। পানি ঢালতে গিয়েই বিপত্তি। মাটির কলস তিন টুকরো হয়ে ছড়িয়ে যায়।

নির্বাক ছমিরন সোবাহানের হাপানো দেখতে থাকে।

হাত মুছতে মুছতে কাছে আসে সোবাহান। ফুলে ডৌল হওয়া স্তনে সমবেদনার স্পর্শ, ছমিরনের গালে ঠোট ছোয়ায়।

শ্যামলা কপোল চিক চিক করে ছমিরনের।

সোবাহান আর্দ্রতা মুছে দেয়। ফিশফিশিয়ে বলে, যাঃ। *বিরাট ভুল অইয়া গ্যাছে,* আসলে...

অসম্পূর্ণ মন্তব্যের গভীরতা জানার আগ্রহ দেখায় না ছমিরন। টসটসে দৃষ্টি ছবির মুখলাবণ্যে স্থির হয় আর ছবিও যেমন *ক্যাত ক্যাত* করে সোবাহানের চোখ বরাবর দৃষ্টি তোলে।

সোবাহান যেন এমন মুহূর্তটির অপেক্ষায়ই ছিল। শতকরা একশ ভাগ বাৎসল্য দিয়ে ছবিকে কোলে নেয়। ক্ষুদ্র কপালে কালো ঠোট জোড়া ঘষতে ঘষতে বলে, *আমারে মাপ কইরা দেন আম্মাজান আর ভুল অইবে না।*

মুখ গোজ করা ছমিরন সর্দি ঝেড়ে হাতের পিঠে আর্দ্রতা মুছে বলে *সালেহা বু সুজি বানাইয়া দিয়া গ্যাছে। দ্যাকছো ছমি, মায় আমার কি সুন্দর কইরা চাইয়া রইছে।*

দ্যান অরে। ভিজাইয়া দেলে হ্যায়সে ... অ্যামমেই আমনের গায় আইস্টা গোন্দো।

ছবিকে মায়ের কোলে দিয়ে সোবাহান ওঠে, চুল আচড়ায়। বগল, ঘাড়ে পাউডার ঘষতে ঘষতে বলে, *ম্যানেজার কইচে আইজ সোম্ভাব বেতন অইবে। কাইল আল্লাহ দেলে তগোরে ঢাহা নিয়া বড় ডাক্তার দেয়ামু। বেজার থাহিস না বৌ। আমারে বিদায় দে। দেরি অইলে সুপারভাইজার খ্যাচ খ্যাচ করে।*

সোবাহান প্রিয় কন্যার কপালে শেষ চুমু দিয়ে বেরিয়ে যায়।

সোয়েটার ফ্যাক্টরিতে সোবাহানের সঙ্গে সাত মাসের পরিচয় এবং পরিণয় থেকে প্রাপ্তি একমাত্র কন্যা ছবির কান্না থামাতে মরিয়া ছমিরন। ব্যাথাতুর স্তনের দুধ বাচ্চাকে দেয়া ঠিক হবে!

ছমিরন ওঠে, খাবার থালাটা কি ভেবে শিকেয় তুলে ঢেকে দেয়। দরজা লাগিয়ে পরিধেয় শাড়ি খুলে পরিপাটি করে। বাম চোখটা কেমন যেন দ্রুতগতিতে লাফাচ্ছে, ভয় হয় ছমিরনের। উদাম বুকে থুথু ছিটায়। উন্মুক্ত স্তনে হাত দিয়ে ব্যথার গভীরতা উপলব্ধি করে হাতপাখাটি খুজে নিয়ে বিছানায় ফিরে বেডসুইচ অফ করে। ছবির আর্তচিৎকার আর বাধ মানে না। হা করা ঠোটে ডান স্তনের বোটা ডুবিয়ে দোয়া দরুদ পড়তে থাকে।

এক সময় নিস্তেজ হয় ছবি। পরিপাটি করে কন্যার মুখাবয়ব দেখতে থাকে ছমিরন। গর্বে বুকটা ভরে যায়। মার্চের ২৬ তারিখ ছবির জন্ম আর ওর বাপের জন্ম একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর। কি অদ্ভুত!

চোখে হাজারো স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, প্রশ্ন ও আশংকা। কোনটাকে গুরুত্ব দেবে ছমিরন। ভাবনার আয়েশে কখনো তন্দ্রা ভর করে। একটা দুঃস্বপ্নে বিচলিত, চারদিকে শোরগোল। ক্রাউড ক্রমেই বাড়ছে। সহসা ঘুম ভেঙে যায় ছমিরনের। কারা যেন দরজায় আঘাত করছে।

কে, কেডা?

গোঙানির মতো শোনা যায় ছমিরনের কণ্ঠস্বর। ওপাশ থেকে রাহেলার ভয়ার্ত চিৎকার।

এ ছেরি! ছোবান কোই?

হের তো নাইট শিফট। ক্যান, কি অইছে।

তারাতারি বাইরা। গারমেনছের দলান ভাইঙ্গা পরছে।

সাভার পলাশবাড়ি স্পেকট্রাম সোয়েটার ফ্যাক্টরিতে ঘটে গেছে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

আল্লাহ গো।

ঘুমন্ত ছবিকে দুই স্তনের মাঝে চেপে ধরে ইস্পাতকঠিন ভাবে। এবং সেখানেই মৃতপ্রায় ছমিরন দিন রাত নিষ্পলক দৃষ্টি স্থির করে রাখে স্পেকট্রামের ধ্বংসস্তূপের দিকে।

বিয়ের দিন স্টুডিওতে তোলা যুগল ছবি হাতে নিয়ে আর্মি, পুলিশ, ফায়ারকর্মী বা র‍্যাব যাকে সামনে পায় তাকেই জিজ্ঞাসা করে, *এনারে কি আমনেরা হাসপাতালে নেছেন। ছোবান, এই ফটো। হ্যার আরেকটা নাম বিজয়। মোর হাউরির দেয়া নাম। গারমেনছে সোম্ভাব হে নামে কেউ চেনে না। যদি আমনেগোড্ডে কয়।*

নয় দিন পর রাহেলার স্তন্য পানরত বক্ষ থেকে ছবিকে হ্যাচকাভাবে টেনে নেয় ছমিরন। *এ মাগি, কইছি না, মোর মাইয়ারে তোর দুধ খাওয়াবি না।*

কয়েক পা ঘুরে আবার ফিরে আসে ছমিরন। *বুঝি মুই ওই দালানের সিড়িকোডার মনুরে একটু দুদ কাওয়াইয়া আই। আর হোন, এর মোদ্দে অর বাফে বাইরাইয়া জিঙ্গাইলে কইস, মোর রোগবালাই ভালো অইয়া গ্যাছে। তুই ঘরে ল বুইন। ওনারা কইছে এহানে আর লাশ নাই। হুইঙ্গা দ্যাক, গন্দ বাইরান কইম্যা গ্যাছে।*

থমকে যায় ছমিরন, ছবিকে বুকে ঠেসে সহসা চিৎকার করে ওঠে, *বেউদা কতা কবি না মাগি। হের গোন্দো মুই জানি। বিজয়ের গা-ইদ্যা মড়কের গোন্দো আইবে ক্যা?*

মতিঝিল, ঢাকা থেকে

সীমাপু

– রকিব

প্রতি বছর ঈদ এলে মনে পড়ে যায় সীমাপুর কথা। সীমাপু যদিও এ মুহূর্তে আমার কাছে নেই, অবস্থান করছেন আমার থেকে অনেক দূরে। বিশেষ একটা কারণে সীমাপুকে ভুলতে পারছি না। আর ভুলে যাই বা কেমন করে? সীমাপু আমাকে খুব স্নেহ করতেন, আদর করতেন, ভালোবাসতেন।

সব সময় সীমাপুর সঙ্গে থাকতাম। সীমাপুর ছোট কোনো ভাই ছিল না। আমাকে সব সময় তার কাছে রাখতেন।

সীমাপু ছিল আমার খালাতো বোন। বয়সে আমার চেয়ে ছয় সাত বছরের বড় হবে। ঈদ এলে আমাকে নতুন শার্ট–প্যান্ট–জুতো সবই কিনে দিতেন। ঈদের দিন সকালে গোসল করার পর নিজ হাতে আমাকে এসব পরিয়ে সাজিয়ে দিতেন আর আমার দিকে চেয়ে চেয়ে মিটমিট করে হাসতেন।

আপুর হাসি দেখে লজ্জা পেতাম।

খালাম্মাদের বাড়িতে থাকতাম, সেখানেই পড়াশোনা করতাম। আমি যখন প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র, আপু তখন কলেজের ছাত্রী। আমাকে পড়াশোনায় সাহায্য করতেন। রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ করে এক সঙ্গে আপুর সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমাতাম। বয়সের পার্থক্যের কারণে কেউ কিছু মনে করতো না।

আমি যখন হাই স্কুলের ছাত্র, আপু তখন ডিগ্রির ছাত্রী। আপু পড়াশোনার ব্যাপারে যথেষ্ট হেলপ করতেন। আপুর অনুপ্রেরণায় মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করতে শুরু করলাম।

আপুর জন্য বিয়ের পাত্র এলে আপু কেন জানি বিরক্ত বোধ করতেন। একদিন আপুর কাছে জানতে চাইলাম কি ব্যাপার আপু, তোমার জন্য পাত্রপক্ষ দেখতে এলে তুমি ফিরিয়ে দাও কেন? বিরক্ত বোধ করো কেন?

আপুর একটাই উত্তর, সেটা তুমি বুঝবে না।

আপুকে আর কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিনি।

ঈদের একদিন পর বাসার সবাই গেছে বেড়াতে। আমি আর আপু আলাদা বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছি। যদিও আমি আর আপুর সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমাই না।

আমি তখন ক্লাস নাইন কি টেন–এর ছাত্র। ছোট্টবেলায় আমাকে জড়িয়ে ধরে যেভাবে ঘুমাতেন সেভাবে এসে আপু আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

ঘুম ভেঙে গেল আমার। আপুকে বললাম, আমি কি সেই ছোট্ট আছি যে আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাতে হবে?

আপু মৃদু হেসে বললেন, কে বলেছে তুমি বড় হয়ে গেছো?

তুমি তো আমার কোলে ভালো করে বসতেই পারো না। অনেক দিন ধরে আজকের রাতটির জন্য আমি অপেক্ষা করছি। বলে আপু আমার পরনের লুঙ্গি খুলে ফেললেন। এরপর গায়ের জামা।

আমি তো লজ্জায় মরি মরি অবস্থা।

আপুকে বললাম, একি করছো তুমি!

আপুর উত্তর, দেখ না কি করি। এই বলে নিজের পরনের পোশাক খুলে নগ্ন হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

আপুকে বললাম, ছিঃ ছিঃ, ছিঃ একি করছো তুমি, আমাকে ছাড়ো, আমাকে ছাড়ো।

আপুর একটাই উত্তর, আজ কোনো ছাড়াছাড়ি নেই।

তুমি আমার বয়সে বড়, বড়দের সঙ্গে ছোটরা কি এসব করতে পারে?

এসবে বড় ছোট লাগে না। এই বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে গোঙাতে লাগলো।

অনভিজ্ঞ আনাড়ি ভাবে যতোটুকু সম্ভব আপুর তপ্ত দেহকে নিস্তেজ করলাম। আপু আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, পটু কোথাকার।

পরদিন সকালে আমাকে পাচশ টাকার একটি নোট দিয়ে বলেন, এটা তোর জন্য বরাদ্দ ছিল। নিতে না চাইলেও এক প্রকার জোর করে আমাকে দিলেন।

এরপর থেকে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়তেন, আপু চলে আসতেন আমার বিছানায়। কামনার আগুন নিভিয়ে চলে যেতেন।

আমি যখন কলেজে ভর্তি হই তখন খালাম্মাদের বাড়ি ছেড়ে চলে আসি। আমার চলে আসায় আপুকে মন খারাপ করতে দেখেছি।

একদিন আপুকে চিঠি দিয়ে বলেছি, অনেক হয়েছে, এবার বিয়ের পিড়িতে বসো।

চিঠিতে আপু বলেছিলেন বিয়ে বসলে, তোমার সঙ্গেই বসবো।

আমি চিঠিতে বলেছিলাম, এ কি করে সম্ভব? তোমার-আমার বয়সের সে ব্যবধান তা কেউ মেনে নেবে না।

এরপর আপুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখিনি।

ঈদের পর যখন কলেজ খুললো তখন কলেজে গিয়ে দেখি আমার নামে একটি চিঠি এসেছে। চিঠি খুলে দেখি সীমাপুর বিয়ের কার্ড। সেখানে লেখা, তোমার বৌ হতে না পারলেও আরেকজনের বৌ হতে হচ্ছে আমাকে। কিভাবে যাবো আপুর বিয়েতে সেটাই ভাবছিলাম। দুই হাজার টাকা দিয়ে একটি লাল রঙের শাড়ি কিনেছিলাম আপুকে দেবো বলে। সেটা আর দেয়া হয়নি।

বিয়ের তিন চার দিন বাকি। নিজের বিয়ের নিমন্ত্রণ দিয়ে বাসায় ফিরছিলেন রিকশায় চড়ে। একটি ট্রাক সজোরো ধাক্কা মারলো রিকশাকে। রিকশার ভেতর থেকে বাইরে ছিটকে পড়লেন। গুরুতর আহত সীমাপু। সবাই ধরাধরি করে নিয়ে গেল হাসপাতালে। কিন্তু লাভ হলো না। এর আগেই পরপারে চলে গেলেন।

এ খবর যখন আমার কানে এসে পৌছলো তখন মনে হলো আমার মাথায় যেন বাজ পড়েছে। সীমাপুর জন্য কেনা লাল শাড়িটি দেয়া হয়নি তাকে। যখনি ঈদ আসে তখনি মনে পড়ে সীমাপুর কথা।

যে আপু আমাকে নিজ হাতে পরিয়ে দিতেন তার কেনা সেই শার্ট-প্যান্ট-জুতা। আমি ভুলতে পারি না সেই স্মৃতি সে স্মৃতিগুলো ঈদ এলে আমাকে এখনো তাড়িয়ে বেড়ায়। সীমাপুর জন্য কেনা শাড়িটা এখনো সযত্নে রক্ষিত আছে আলমারিতে, যেটা দেখলে চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে আমার।

নীলফামারী থেকে

পায়জামা

– সাইফ

আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আমার বাবা দুই বিয়ে করেছেন। সব মিলে আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা পনেরো।

আমার আপন মা মারা যাওয়ার পর আব্বা দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। সেই আট নয় বছর বয়সে মা মারা যাওয়ার পর থেকে আব্বা কোনোদিন আমাদের জন্য নিজ থেকে নতুন জামা কিনে দিয়েছেন কি না জানি না।

পাঠক হয়তো ভাবছেন, আমরা কি তাহলে ন্যাংটা ছিলাম। তা নয়। বন্ধু-বান্ধব ও বড় বোনদের সামান্য সহযোগিতা আমাদের চলার পথ প্রশস্ত করেছে।

আমি মাদ্রাসার ছাত্র ছিলাম। ১৯৯৪ সালে দাখিল পরীক্ষার সময় সরকার যখন নতুন নিয়ম অনুযায়ী পায়জামা পরে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তখন আমার বাবাকে পায়জামা বানানোর কথা বলতেই তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। কেন তিনি দিলেন না তা জানি না, যদিও হাজার খানেক পায়জামা বানিয়ে দেয়ার খরচের সামর্থ তার ছিল।

ইচ্ছা ছিল নতুন পায়জামা পরে ঈদ করবো, এরপর পরীক্ষা দেবো। কিন্তু নতুন পায়জামা পরার ইচ্ছা আমার বুকে ধারণ করেই আমার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল লজিংবাড়িতে চলে গেলাম।

সমস্যা বাধলো পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে। আমার হার্টবিট বেড়ে যাচ্ছিল। পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়া ছেড়ে তখন আমার কাছে পরীক্ষায় কিভাবে অংশগ্রহণ করবো তা নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছি। কেননা আমার কাছে এমন টাকা ছিল না যে একটা পায়জামা বানাবো।

পরবর্তীকালে অনেক চিন্তা ভাবনা করে আমার সিনিয়র এক ভাইয়ের কাছ থেকে তার পায়জামা নিয়ে এসে পরীক্ষায় অংশ নিই।

২০০৩ সালে একটি প্রাইভেট কলেজে চাকরির সুবাদে আড়ং থেকে একটি পাঞ্জাবি কিনে ঈদে বাড়ি গিয়েছিলাম নতুন পাঞ্জাবিটি গায়ে দিয়ে। অনেক জায়গায় বেড়ানোর শখ থাকলেও তা হয়ে ওঠেনি।

নিষ্ঠুর নিয়তি আমার আনন্দকে ধুলায় মিশিয়ে দেয়। ঈদের নামাজ পড়ে বাড়ি ফেরার সময় গেটের সঙ্গে খোচা লেগে পাঞ্জাবিটার অনেকটা ছিড়ে যায়।

তবে এবার আমার ভালো চাকরি হয়েছে। ভাবছি এবার ঈদে সকলের জন্য জামা-কাপড় কিনে নেবো।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

গুজব

– দেলোয়ার হোসেন সরকার

গুজব ছড়াবেন না, গুজবে কান দেবেন না, দেয়ালেরও কান আছে, গুজব না গজব।

এগুলো জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন আমলের কিছু পোস্টারের ভাষা। গুজবে তথ্য বিকৃতি ঘটে এবং জনমনে ভীতি ও আতংক সৃষ্টি করে, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটায় এটা জানতাম। কিন্তু গুজবে কি পরিমাণ তথ্য বিকৃতি ঘটতে পারে তা এই বাস্তব অভিজ্ঞতাটা না হলে হয়তো বুঝতে পারতাম না।

১৯৬১ সাল। আমি রংপুর কারমাইকেল কলেজের আইএসসি ক্লাসের ছাত্র। উত্তরবঙ্গে রাজশাহী সরকারি কলেজ, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ এবং রংপুর কারমাইকেল কলেজ – এ তিনটিই ছিল নামকরা কলেজ। তবে বিরাট এলাকা ও নির্মাণশৈলীর জন্য কারমাইকেল কলেজই ছিল সেরা। বিরাট এলাকা জুড়ে এই কলেজ শহর ও আবাসিক এলাকা থেকে বেশ দূরে নিরিবিলি শান্ত পরিবেশে থাকায় বিদ্যাশিক্ষা চর্চার জন্য একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হতো। কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষক কর্মচারীদের বাসাবাড়ি ছাড়া আশপাশে অন্য কোনো জনবসতি ছিল না বললেই চলে। এখন অবশ্য কলেজটি শহরের সঙ্গে প্রায় যুক্ত হয়ে গেছে।

কলেজ গেটের সামনে সপ্তাহে দুই দিন হাট বসতো। সেখানে *শ্রীর হোটেলে* আমরা নাশতা খেতাম। দুই একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দোকান ছাড়া আর কোনো স্থায়ী দোকান ছিল না। কলেজে তিনটি হস্টেল ছিল – *জিএল হস্টেল, সিএম হস্টেল* ও একটি *হিন্দু হস্টেল*। এর মধ্যে জিএল হস্টেলটাই ছিল বড়, দোতলা ও সুন্দর যাতে অনেক ছাত্র থাকতো। আমি এখানেই থাকতাম।

কলেজ তখন রমজানের জন্য বন্ধ। রমজানের পরেই পরীক্ষা। কাজেই আমরা কিছু ছাত্র বাড়ি না গিয়ে হস্টেলে থেকে একেবারে পরীক্ষার পর বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কলেজ খোলা থাকলে হস্টেলে অনেক ছাত্র থাকতো। ফলে প্রতিবেলায় যে খাবার বেচে যেতো সেগুলো খাওয়ার জন্য অনেক গরিব মিসকিন ভিড় করতো। এখন অল্প কিছু ছাত্র থাকায় সে রকম ভিড় হয় না। তবু দুই একজন গরিব-মিসকিন প্রতিদিন খেয়ে যেতো।

এমনি একদিন সন্ধ্যায় বাবুর্চি এসে বললো, একটা প্লেট নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।

ম্যানেজার তো এ কথা শুনে মহা রাগ। রেগে বললো, প্লেট খুজে বের করো, না হলে প্লেটের দাম তোমার বেতন থেকে কাটা হবে।

বয়-বাবুর্চিরা অনেক ভাবনা-চিন্তা করে অনুমান করলো, যে লোকটা দুপুরে খেয়ে গিয়েছিল সেই সম্ভবত প্লেটটি নিয়ে গেছে। কারণ খাওয়ার পর লোকটি প্লেটটি জমা দিয়েছে কি না তা কেউ মনে করতে পারলো না। কাজেই এরপর তারা আরো সাবধান হয়ে গেল পরদিন দেখা গেল ওই লোকটিই আবার এসেছে। এবার তাকে খাবার দিয়ে আড়াল থেকে নজর রাখা হলো। দেখা গেল লোকটি খাওয়ার পর প্লেটটি আবার ঝুলিতে ভরে রওনা দিচ্ছে। অমনি তাকে ধরে বয়বাবুর্চিরা আমাদের কাছে নিয়ে এলো। তারপর ছেলেপেলেদের ব্যাপারে যা হয়, কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে প্রথমে হস্তসুখ মেটানো হলো, এরপর আর কি করা যায় তা এ নিয়ে গবেষণা শুরু হলো।

একজন বললো, মাথা মুড়ে দেয়া হোক।

আমার পার্টনার বদরুল আলম মুকুল সব ব্যাপারে অতি উৎসাহী। সে তৎক্ষণাৎ একটি ব্লেড নিয়ে এলো এবং বেশ ডিজাইন করে সামনে কিছুটা মধ্যে কিছুটা পাশে কিছুটা এবং পেছনে কিছুটা কামিয়ে দেয়া হলো।

এখন কি করা হবে এ নিয়ে আবার গবেষণা শুরু হলো। সিদ্ধান্ত হলো চুন-কালি মাখিয়ে গলায় জুতার মালা পরিয়ে ক্যাম্পাস ঘোরানো হোক।

সেই মতো কাজ শুরু করার আগেই দেখা গেল এক ছেলে দৌড়ে আসছে।

ব্যাপার কি?

ছেলেটি হাপাতে হাপাতে এসে বললো, দারোগা আসছে।

সবাই একযোগে জিজ্ঞাসা করলো, কেন?

সে বললো, সে নাকি পৃন্সিপালের কাছে গিয়ে চোর ধরার কথা বলাতে পৃন্সিপাল থানায় ফোন করেন।

কারমাইকেল কলেজের পৃন্সিপালের ফোন! দারোগা নাকি তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে গেছে।

দারোগা-পুলিশের কথা শুনে দুই একজন সটকে পড়লো।

কেউ বললো, এখন বোঝো মজা। চোর ধরেছো তো থানা-পুলিশ আছে, আইন-আদালত আছে, মাথা মুড়ানোর তো কোনো আইন নেই।

একজন বললো, গোটা মাথাটা ন্যাড়া করে দাও যাতে বলা যায়, সে আসলে ন্যাড়াই ছিল।

বুদ্ধিটা পছন্দ হলো। তাড়াতাড়ি করে বাকি চুল সব পরিষ্কার করে কামিয়ে দিয়ে লোকটিকে কয়েকজনের জিম্মায় রেখে আমরা ভাগলপুর।

আমি ও পার্টনার গিয়ে লালবাগে শ্রীর হোটেলে গিয়ে বসলাম। শ্রীর হোটেল জিএল হস্টেল থেকে তিন চারশ গজ দূরে হবে। দারোগা এলে এ রাস্তা দিয়েই আসবে।

কিছুক্ষণ পরেই দারোগা একজন সিপাই সঙ্গে নিয়ে সাইকেলে করে হোটেলের সামনে দিয়ে গেল।

সে সময় কলেজ ক্যাম্পাসে কোনোদিন পুলিশ আসতো না। তাই পুলিশ দেখে হোটেলের লোকজন সব আশ্চর্য হয়ে গেল। হঠাৎ করে সব আলোচনা থেমে গিয়ে এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। একে অপরের কাছে জানতে চাইলো কি ব্যাপার?

একজন বললো, আরে, শোনেননি? জিএল হস্টেলে চুরি হয়েছে।

অন্য একজন বললো, চুরি! কন কি! কি চুরি?

প্রথমজনের জবাব, আর বলবেন না! ছেলেদের কাপড়-চোপড়, টাকা-পয়সা, ঘড়ি, আংটি, বাসন-কোসন এই আর কি!

সে যা বললো তাতে কয়েক হাজার টাকার মাল তো হবেই।

পাঠক ভেবে দেখুন, গুজব কিভাবে ছড়ায়?

সেই আমলে একটি দশ বারো টাকার প্লেট চুরির খবর যদি তিন চারশ গজ যেতে কয়েক হাজার টাকায় দাড়ায় তাহলে ওই খবরটি রাজধানী ঢাকায় পৌছাতে কি রূপ নিতো?

সব শুনে আমরা হাসতে হাসতে হোটেল থেকে বের হয়ে এলাম।

রৌশনাবাগ, পঞ্চগড় থেকে

নিরানন্দ

– মোহাম্মদ নাজমুস সাকীব নভো

২০০৪ সালের কথা। এক মাস রোজার পর এলো ঈদ। আমার মনে আনন্দ আর ধরে না। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, এবার ঈদের দিন আমরা চার বন্ধু মিলে বন্ধু রফিকের বাসায় যাবো। সে প্রোগ্রাম অনুযায়ী কবির, মাজহার ও পার্থ এলো আমার বাসায়। মা সবাইকে খাবার দিলেন ও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন।

জোহরের নামাজ আদায় করে আমরা প্রফুল্ল চিত্তে রফিকের বাড়ির দিকে রওনা হলাম। রফিকের বাসা ঝিগাতলা। রফিকের বাসায় গিয়ে আমরা যা দেখলাম তাতে আমাদের ঈদের আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে উবে গেল।

রফিকের বাবা অনেক দিন থেকেই হৃদরোগে ভুগছিলেন। আগে তার দুবার স্ট্রোক হয়েছে এবং শরীরের এক অংশ অবশ হয়ে গেছে। আজ কিছুক্ষণ আগে আবার তার স্ট্রোক হয়েছে। বাড়িতে থমথমে অবস্থা। বাসায় সবাই কান্নাকাটি করছে। এরই মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স এসে হাজির। রফিককে সাহস দিয়ে বিমর্ষ চিত্তে বাড়ি ফিরে গেলাম।

সেদিন রাতে আবার রফিকের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিন্তু নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্তে নয়, বরং রফিকের বাবার জানাজায় নামাজ আদায় করতে। রফিকের মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। রফিক আমার অত্যন্ত ভালো বন্ধু। ভাবলাম আজ ঈদের দিনে রফিকের পরিবারের সদস্যদের মানসিক অবস্থার কথা।

ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে খুশি। কিন্তু তা সব সময় সবার বেলায় খাটে না। যেমন রফিকের পরিবারের কথাই ধরুন, সেবারের ঈদ কি তাদের জন্য আনন্দের ছিল?

সেগুনবাগিচা, ঢাকা থেকে

ম্যারাথন অফ হোপ

– ফরিদ আহমেদ

প্রতি বছর হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক কানাডাসহ সারা বিশ্বে আয়োজন করে টেরি ফক্স রান। সাধারণত কানাডায় টেরি ফক্স রান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সেপ্টেম্বর মাসে লেবার ডে-র পর দ্বিতীয় রবিবারে। কানাডার বাইরের অন্যান্য দেশে আয়োজকদের যার যার সুবিধা মতো দিনে এই দৌড়ের আয়োজন হয়ে থাকে। এ বছর কানাডায় এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেপ্টেম্বরের ১৮ তারিখে।

টেরি-র জন্ম হয়েছিল ম্যানিটোবার উইনিপেগ শহরে। টেরির জন্মের কয়েক বছর পরই তার পরিবার পাড়ি জমায় বৃটিশ কলাম্বিয়ার ভ্যাংকুভারের কাছে পোর্ট ককুইটলামে। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলার প্রতি অদম্য আগ্রহ টেরির। যদিও গ্রেড এইটের বাস্কেটবল টিমের সবচেয়ে খারাপ খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। পোর্ট ককুইটলাম সেকন্ডারি স্কুলের শেষ বর্ষে টেরি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাগ অ্যালওয়ার্ডের সঙ্গে যৌথভাবে বর্ষসেরা অ্যাথলিটের সম্মান অর্জন করেন। পরে টেরি সাইমন ফ্রেজার ইউনিভার্সিটিতে শারীরিক শিক্ষা বিভাগে পড়া শুরু করেন।

১৯৭৭ সালে টেরির হাটুতে অসহ্য ব্যথা শুরু হয়। দাড়িয়ে থাকাটাই অসম্ভব হয়ে দাড়ায় তার জন্য। এই অবস্থায় হসপিটালে গেলে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তাররা জানান, টেরি ওসটেওজেনিক সারকোমা, এক ধরনের অস্থির ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। টেরি-কে বাচাতে হাটুর ছয় ইঞ্চি উপর থেকে তার ডান পা কেটে ফেলা হয়।

কৃত্রিম পা দিয়ে নতুন করে আবার হাটা শিখতে হয় টেরিকে। দৃঢ় সংকল্পের কারণে অস্ত্রোপচারের মাত্র ছয় সপ্তাহ পরই গলফ খেলতে সক্ষম হন তিনি। এমনকি বাস্কেটবলও ফিরে আসে তার জীবনে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু রিক হ্যানসেনের স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত। স্পাইনাল কর্ড রিসার্চের জন্য সচেতনতা ও অর্থ সংগ্রহের জন্য হুইলচেয়ারে দুই বছরে বিশ্ব প্রদক্ষিণ করেছেন) আমন্ত্রণে হুইলচেয়ার বাস্কেটবল খেলায় অংশগ্রহণ করেন টেরি।

হসপিটালের সেই দুঃসহ অভিজ্ঞতার কথা টেরি কখনোই ভোলেননি। ক্যান্সার চিকিৎসায় কানাডার অপ্রতুল ব্যয় দেখে টেরি বিক্ষুব্ধ। টেরি তার এই ক্রোধ রূপান্তরিত করেন এক মিশনে। ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য টাকা সংগ্রহ করতে হবে। প্রচুর টাকা। সেই সঙ্গে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সচেতনতাও বৃদ্ধি করতে হবে আর এর জন্য

তিনি দৌড়াবেন সুবিশাল কানাডার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। টেরির ধারণা ছিল যদি সারা দেশের লোক মাত্র এক ডলার করেও দেয় তাহলে সংগৃহীত হবে দুই কোটি চল্লিশ লাখ ডলার। সেই সময় কানাডার জনসংখ্যা ছিল দুই কোটি চল্লিশ লাখ।

শুরু হয় নিরলস ট্রেনিং পর্ব। ট্রেনিংয়ের শুরুতে টেরি তার পরিকল্পনা গোপন রাখেন পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে। তাদেরকে জানান ভ্যাংকুভার ম্যারাথনে অংশ নেয়ার জন্য তিনি প্র্যাকটিস করছেন। প্র্যাকটিসের প্রারম্ভিক সময়টা ছিল কঠোর। প্রথম দিকে বেশির ভাগ সময় তাকে ব্যয় করতে হতো শুধু মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়া ও নিজেকে কষ্ট করে খাড়া করার পেছনে। তবু এগিয়ে চলে প্রস্তুতি। এক বছরে চার হাজার আটশ কিলোমিটারেরও বেশি দৌড়ানোর পর টেরি পরিবারের সদস্যদের কাছে তার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।

১৯৮০ সালের ১২ এপ্রিল নিউফাউন্ডল্যান্ডের সেইন্ট জন শহর থেকে সামান্য কিছু লোকের উপস্থিতিতে টেরি শুরু করেন তার ঐতিহাসিক দৌড়।

টেরি তার এই দৌড়ের নাম দিয়েছিলেন *দি ম্যারাথন অফ হোপ*। The marathon of hope.

এ এক অসামান্য অভিযান। মানুষের কল্যাণের জন্য নিশ্চিত মৃত্যু পথযাত্রী মৃত্যুঞ্জয়ী এক তরুণের মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দেয়ার দৌড়। কানাডিয়ানরা এ অনন্যসাধারণ অভূতপূর্ব দৌড়ের কথা কখনোই ভুলবে না।

প্রাথমিকভাবে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা কঠিন হলেও অতি দ্রুত মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সেই সঙ্গে বাড়তে লাগলো সংগৃহীত টাকার পরিমাণ। বরফ শীতল বৃষ্টি, প্রচণ্ড বাতাস, এমনকি তুষারপাতকে অগ্রাহ্য করে টেরি প্রতিদিন প্রায় বিয়াল্লিশ কিলোমিটার দৌড়াতেন। সন্দেহবাদীদের ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে দিনের পর দিন দৌড়ে টেরি অতিক্রম করে যান একে একে ডার্টমাউথ, শার্লটটাউন, মন্ট্রিঅল, টরন্টো। এরই মাঝে চলতে থাকে বিভিন্ন স্থানে আবেগ প্রবণ বক্তব্য দেয়া, যা স্পর্শ করে যায় অসংখ্য মানুষের হৃদয়।

একশ তেতাল্লিশ দিনে পাচ হাজার তিনশ তিহাত্তর কিলোমিটার দৌড়ানোর পর বুকে প্রচণ্ড ব্যথার কারণে অন্টারিও–র থান্ডার বে–র কাছে থামতে বাধ্য হন টেরি। টেরিকে নিয়ে যাওয়া হয় হসপিটালে। জানা যায়, তার ফুসফুসও আক্রান্ত হয়েছে ক্যান্সারে। এই সংবাদে সারা জাতি হয়ে পড়ে হতবাক ও বেদনাকাতর।

টেরিকে ছাড়াই এগিয়ে চলে ম্যারাথন অফ হোপ। সংগৃহীত হয় দুই কোটি একচল্লিশ লাখ সত্তর হাজার ডলার যা টেরির প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি।

হসপিটালে থাকা অবস্থায়ই টেরি জানতে পারেন অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রতি বছরই এ ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হবে যার নাম হবে *টেরি ফক্স রান*। টেরিই এ ম্যারাথনের জন্য বেশ কিছু নির্দেশিকা তৈরি করে দিয়ে যান যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, এই আয়োজনটি হবে সম্পূর্ণ অপ্রতিযোগিতামূলক। কোনো বিজয়ী থাকবে না, থাকবে না কোনো পুরস্কার। উদ্দেশ্য হবে শুধু ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহ।

১৯৮১ সালের জুন মাসের ২৮ তারিখে মাত্র বাইশ বছর বয়সে টেরি ফক্স মৃত্যুবরণ করেন। মারা যাওয়ার আগে ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে টেরি ফক্স অর্জন করেন কানাডার সর্বশ্রেষ্ঠ পদক *অর্ডার অফ কানাডা*। থান্ডার বে–তে টেরির স্মরণে গড়া হয়েছে তার এক বিশাল ভাস্কর্য। কানাডিয়ান রকি–র একটি চূড়ার নামকরণও করা হয়েছে টেরির নামে।

টেরির মা তার ছেলেকে বর্ণনা করতেন অতি সাধারণ এক ছেলে বলে। এই অতি সাধারণ ছেলেটিই আজ পরিণত হয়েছে কানাডার জাতীয় বীরে। কোটি কোটি কানাডিয়ানদের কাছে যা কিছু সুন্দর ও ভালো, যা কিছু মহৎ ও নিঃস্বার্থ, যা কিছু অনুপ্রেরণাদায়ী ও আশাদাত্রী তার সব কিছুরই প্রতিভূ টেরি।

শুধু কানাডিয়ানদের কাছেই নয়, বিশ্বের সকল মানবতাবাদী মানুষের কাছেও টেরি তাই।

উইন্ডসর, অন্টারিও, কানাডা, থেকে

farid300@gmail.com

হতবুদ্ধি

– উম্মে হাবীবা ইয়ামীন

গত বছর আমার ভাগ্নির বয়স যখন দেড় বছর ছিল তখন তাকে রাত দুই–তিনটার দিকে ঘুম থেকে উঠে ফিডার খাওয়াতে হতো। তখন এক রাতে আমি আর আমার বড় বোন ঘুমিয়েছি, মাঝখানে আমার ভাগ্নি।

ঘড়িতে দুটার সময় এলার্ম দিয়ে রেখেছিলাম বলে যথাসময় আমাদের ঘুম ভাঙলো। সেদিন হয়তো একটু দেরি করেই ঘুমিয়েছিলাম। ফলে আমাদের ঘুম ঘুম ভাবটা ছাড়তে চাইছিল না। ঘুম থেকে উঠে কোনো মতে হাতড়িয়ে খাট থেকে নামলাম।

আপু বললেন, তাড়াতাড়ি মোম জ্বালা।

অন্ধকারে ম্যাচ খুজে মোম ধরালাম। কিন্তু ফ্যানের বাতাসে মোম নিভে গেল। আবার মোম ধরালাম। আবারও ফ্যানের বাতাসে সেটা নিভে গেল।

আপু বললেন, ফ্যানটা বন্ধ করে নে না।

তখন ফ্যান বন্ধ করে মোমের আলোয় এক ফিডারে দুধ বানালাম অতি কষ্টে। কারণ একদিকে গরমে ঘেমে যাচ্ছি, আরেকদিকে মশার কামড়।

এতো কষ্টে দুধ বানিয়ে যখন খাটে মশারির ভেতর ঢুকবো তখন আপু বললেন, আচ্ছা আমরা লাইট অন করছি না কেন? ফ্যানই বা বন্ধ করার দরকারটা কি?

তখন আমাদের খেয়াল হলো, আমরা ঘুম থেকে উঠে ভেবেছিলাম কারেন্ট চলে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের দুজনের একজনেরও মনে হলো না, কারেন্ট না থাকলে ফ্যানও চলবে না।

তারপর ফ্যান লাইট অন করে আমার ভাগ্নি অর্নিকে দুধ খাওয়ানো বাদ দিয়ে আমরা হাসতে থাকলাম।

রাত দুটার সময় আমাদের সে হাসি দেখতে কেউ এগিয়ে এলো না।

সাবালিয়া, টাঙ্গাইল থেকে

শিল্পীর অক্ষমতা

– মাখরাজ খান

নিউটন।

আইনস্টাইন।

শেক্সপিয়র।

এই তিনজনের ছবি আলাদা কাগজে একে বাবাকে দেখালো টিপু।

ভারী সুন্দর হয়েছে, বললেন আজিম সাহেব।

মা সুলতানা বেগম পাশের ঘরে ছিলেন। তিনি স্বামীর সঙ্গে যোগ দিলেন। আমাদের টিপুর যা আকার হাত ওকে যদি ঠিক মতো গাইড দিতে পারি তাহলে দেখো সে একদিন সুলতান, জয়নুল বা কামরুলের মতো হবে। সারা দেশে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে।

টিপুর ছবি আকার জন্য ফটোগ্রাফের দরকার হয় না। শুধু নাম বললেই সে যে কোনো বিখ্যাত লোকের ছবি আকতে পারে। হিটলার, মুসোলিনি, আইসেনহাওয়ার, মহারানী ভিক্টোরিয়া – কারো ছবি আকতে কোনো বেগ পেতে হয় না। এ জন্য আজিম এবং সুলতানা বেগমের উৎসাহের অন্ত নেই। বিদেশি ম্যাগাজিন কিনে ঘরের এক কোণা ভরে ফেলেছেন তারা। বাড়িতে কোনো আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত লোক এলেই টিপুকে তার সামনে এনে ছবি আকতে বলেন আর টিপু কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওই ছবিটি একে ফেলে। স্কুলের পড়া, খেলাধুলা, ঘুম, আহার এগুলোর মধ্যে ছবি আকাই টিপুর কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

গত বছর সুলতানা বেগমের খালাতো বোন পারভীন এসেছিলেন। তিনি স্বামীর সঙ্গে আমেরিকায় থাকেন। ১১ সেপ্টেম্বরের বিপর্যয়ের পর টেলিফোন করে পারভীনকে দেশে এনেছিলেন তার মা। টিপুর ছবি দেখে তো তিনি হতবাক।

আরে, এতো দেখি তাজ্জব ব্যাপার! হাতে আকা বুশের এমন নিখুত ছবি আমেরিকায়ও নেই। ছবিটা আমাকে দিয়ে দেন আপা। ছবিটা প্রেসিডেন্টকে পাঠিয়ে দেবো।

এর সপ্তাহ দুই পরেই হোয়াইট হাউস থেকে একটা চিঠি এসেছে টিপুর নামে। লিখেছেন প্রেসিডেন্টের প্রেস সেক্রেটারি প্রেসিডেন্টের শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদসহ।

এখন প্রায় সবার কাছেই সুলতানা বেগম হোয়াইট হাউসের চিঠির কথা উল্লেখ করেন। কোনো কোনো সময় চিঠিটাও দেখান। তবে মূল চিঠি নয়, চিঠিটার ফটোকপি।

সুলতানাকে আজিম বলেন এবার আমাদের টিপু সাংঘাতিক একটা কিছু করে ফেলবে।

পাশের ফ্ল্যাটের মিজান সাহেবের ছেলে স্কলারশিপ পেয়েছে বলে পুরো ফ্ল্যাটের লোককে মিষ্টি খাওয়ালেন। টিপু যদি কমনওয়েলথ বা ইউনিসেফ পুরস্কার পেয়ে যায় তাহলে আমরা এ মহল্লার সবাইকে মিষ্টিমুখ করাবো। সাংবাদিক আসবে, বিটিভি, এটিএন বাংলা, চ্যানেল আইয়ের লোকজন ভিড় করবে, তুমি একটু দূরে থেকো।

কেন? কেন? চেচিয়ে উঠেন সুলতানা বেগম।

তুমি তো কথা বলতে গেলে ইংরেজি বলো আর বাংলা বলতে গেলে সাধু-চলতি মিশিয়ে ফেলো।

কি বললে? আমি বাংলা জানি না। আমি এসএসসিতে দুই নাম্বারের জন্য লেটার পাইনি। ইন্টারমিডিয়েটেও ভালো নাম্বার ছিল। ইংরেজিতে অনার্স করলাম। এমএ-তে তো আমার রেকর্ড মার্কস ছিল। তাই বলে কি বাংলা ভুলে গেছি?

না না তা নয়। তবে তুমি একটু বেশি কথা বলো।

আর তুমি?

একেবারে মেপে মেপে।

এ জন্যই তো তোমার প্রমোশন হয় না।

আজিম কোনো কথা বললেন না। তার ঠোট দুটি টানা দরজার মতো বন্ধ হয়ে যায়। প্রমোশন যে কেন হয় না তা কি করে স্ত্রীকে বোঝাবেন তিনি। এ সমাজে সৎ লোকের চারদিকে শত্রু। যারা সৎ থাকতে চায় তাদের ফেরাউনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। এ লড়াই বাতিলের বিরুদ্ধে হকের লড়াই। সারা দুনিয়ায়ই এখন এ লড়াই চলছে।

কি, কথা বলছো না কেন? সেই যে ডেপুটি ডিরেক্টর হয়ে ঢুকলে আর সামনে যেতে পারলে না। আমার বান্ধবীর হাজব্যান্ড তোমার জুনিয়র ছিল, এখন সে ডিরেক্টর জেনারেল। তোমার এসিআর তো সেই দেয়, তাকে বলতে পারো না? তোমার এসিআর-এ কি লেখা হয় তাও আমি জানি।

আজিম তবু চুপ করে থাকেন। এসিআর-এ কি লেখা হয়, আজিমও জানেন। কিন্তু কাউকে কখনো তোষামোদ করেন না। এসব কথা বলতে গেলে সুলতানা বেগম আরো গরম হয়ে যাবেন, তাই খামোশ থাকাই শেয়:।

আজ জুমাবার। সুলতানা বেগম টিপুর সঙ্গে কি যেন আলাপ করছেন। এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠলো। দরজা খুলে দেখলেন মধ্য বয়স্ক এক ভদ্রলোক, তার সঙ্গে ষোল সতেরো বয়সের একটা মেয়ে।

মেয়েটি সুলতানা বেগমকে হাত তুলে সালাম জানালো।

সুলতানা বেগম বললেন, আপনারা?

মেয়েটি চুপ করে রইলো। ভদ্রলোক জবাব দিলেন। আমি একটা প্রাইভেট ইন্সটিটিউশনের ড্রয়িং শিক্ষক। এ আমার মেয়ে। পাশের ফ্ল্যাটের নিজাম আমার আত্মীয়, তিনিই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

ঠিক আছে, ভেতরে আসুন বসুন। ড্রয়িংয়ের শিক্ষক শুনে সুলতানা বেগম এবং টিপু দুজনেই খুব খুশি। সুলতানা বেগম বললেন, তা বলুন কি মনে করে?

আপনার কলেজে ভর্তির ব্যাপারে, আমার মেয়েটি এ বছর এসএসসিতে 'এ' গ্রেড পেয়েছে।

অন্য কোনো লোক হলে বাড়িতে ভর্তির ব্যাপারে আলোচনায় তিনি বিরক্ত হতেন। কিন্তু ড্রয়িংয়ের শিক্ষক যেখানে তার কাছে এসেছেন সেখানে টিপুর ক্রেডিট দেখানোর সুযোগ আছে। তাই এখন সুলতানা বেগম কলেজের লেকচারার নন, পারেন তো পৃন্সিপাল হয়ে এখনই অ্যাডমিশন দিয়ে দেন।

ঠিক আছে। আপনি তো ড্রয়িংয়ের শিক্ষক, আমার ছেলেও আকতে খুব পছন্দ করে, দেখুন না সে কেমন আকে?

টিপু পেন্সিল কাগজ নিয়ে প্রস্তুত।

সুলতানা বেগম বললেন, বাবু, তুমি নেলসন ম্যানডেলা-র ছবিটা আকো তো?

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাদা কোকড়ানো চুল, দাড়ি গোফহীন ম্যানডেলার মুখ কাগজে ফুটে উঠলো।

ছোট টিপুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন ড্রয়িং শিক্ষক।

এবার জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনান।

একইভাবে টিপু নিখুতভাবে আকলো কফি আনানের ছবি।

কেমন দেখলেন আমার ছেলেকে? গর্বিত সুলতানা বেগমের প্রশ্ন।

ভালো।

আপনি তাকে দুই একটা ছবি একে দিন।

ড্রয়িং শিক্ষক পেন্সিল কাগজ নিয়ে হাটুর ওপর রেখেই আকলেন রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের ছবি।

সুলতানা বেগম এমনভাবে ড্রয়িং শিক্ষকের দিকে তাকালেন যেন এগুলো টিপুর কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ছবি নয়।

টিপু বললো, স্যার, আপনি ফিডেল ক্যাস্ট্রোর ছবি আকতে পারেন?

না।

ইয়াসির আরাফাত।

আকিনি কোনো সময়।

টিপু আর কোনো কথা বললো না।

সুলতানা বেগমও চুপ করে রইলেন।

টিপুকে কিছু বলার জন্য ড্রয়িং শিক্ষক প্রস্তুত হলেন, মুখে তার মুচকি হাসি।

আচ্ছা, তোমাকে একটা ছবি আকতে বলি, পারবে তো?

হ্যা, খুব পারবো, বলুন।

সুলতানা বেগম খুব উৎফুল্ল।

আমাদের দেশের যে কোনো একজন নেতা বা নেত্রীর ছবি আকো।

টিপু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর পেন্সিল দিয়ে কাগজের ওপর আকিবুকি করতে করতে জবাব দিল, পারবো না স্যার।

সুলতানা বেগম বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন, কেন?

টিপু মুখ নিচু করে বললো, জানি না।

সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ থেকে

লাল ঘর

– মাহমুদ আল-হাছান

পঞ্চাশ জমা এক নম্ব-র, গুণতি করো দুই – আলপিন-এর খোচার মতো বুকের ভেতরে গিয়ে যেন বাক্যটা সরাসরি আঘাত করে ফরিদুলের। আবছা আলোয় গাদাগাদি করে শোয়া পঞ্চাশজন মানুষের মধ্যে নিজেকে তার গরু, ছাগলের সমজাতীয় মনে হতে থাকে। এরা সম্ভবত কয়েদিদের এই প্রজাতির জীব হিসেবেই বিবেচনা করে। কারো ক্ষেত খেলে খোয়াড় আর খোয়াড়ে বসে বসে জাবর কাটা। রক্ষীদের এই হাকাহাকিটা গৃহস্থের গোয়ালঘরে রাতে মাঝে মধ্যে উঠে গিয়ে গরুর সংখ্যা ঠিক আছে কি না গুণে দেখার মতো।

রক্ষী আবার হাক ছাড়ে। আচ্ছা, লোকটা ঘুমের ঘোরেও কথা বলে নাকি! রক্ষীটাকে বাবার মতো জব্দ করবো নাকি একবার, মনে মনে ভাবে ফরিদুল।

ফরিদুলদের সাতটা গরু ছিল। প্রতি রাতে ফরিদুলের বাবা দুই তিনবার করে ফরিদুলকে ঘুম থেকে ডেকে বলতো, বাবা দেখতো গোয়ালঘরটা, চোরের যা উৎপাত হয়েছে।

বিরক্ত লাগলেও উঠে টর্চ জ্বেলে গোয়াল ঘরে গরু দেখে আসতে হতো। এক রাতে ফরিদুলকে ডেকে বাবা বরাবরের মতো গরু দেখতে বললে সবাইকে জব্দ করার জন্য ফরিদুল গিয়ে গোয়ালঘর দেখে চিৎকার করে উঠলো, ওমা? গরু যে ছয়টা আর একটা কই।

আর থাকে কে। হুলস্থুল পড়ে গেল চারদিকে। চিৎকার চেচামেচিতে পুরো গ্রাম জেগে টর্চ নিয়ে চোর চোর বলে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। বাড়িতে উঠলো কান্নার রোল।

ফরিদুলের ছোট ভাই গোয়ালঘরে গিয়ে আবার চিৎকার করে উঠলো, আরে, গরু তো ঠিকই আছে।

কথাটা বিশ্বাস করাতে এক এক করে গরু সরিয়ে সবাইকে এনে দেখানো হলো।

ফরিদুলের মা ইতিমধ্যে গরুর জন্যে রোজা মানত করে ফেলেছেন। তিনি সেহরির আয়োজনে লেগে পড়লেন। ফরিদুলের বাবা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এতোগুলো মানুষকে কেন এভাবে হয়রান করলি? ফাইজলামি।

বড় গরুটার ছায়া পড়ছিল তো, আমি একটা গরু ঠিক মতো দেখতে পারিনি।

সেদিন থেকে আর গরু দেখার জন্য বাবা ফরিদুলকে ডাকেন না রাতে।

পাশের লকারের রক্ষীর হাক শোনা যায়। *নব্বই জমা দুই নম্ব-র, গুণতি করো তিন*।

ফরিদুল একটু নড়েচড়ে আস্তে উঠে বসে। একটা বিড়ি খাওয়ার খুব ইচ্ছা হয় তার। এখানে এই জিনিসটাই সবচেয়ে দুর্লভ। দুষ্প্রাপ্যতার কারণেই সম্ভবত খাওয়ার ইচ্ছাটা একটু বেশি হয়। এমন অনেকেই এখানে আসে, দুটা বিড়ির জন্য দুপুরের রুটি দুটোও দিয়ে দিতে পারে। কারো লোক দেখতে এসে এক প্যাকেট বিড়ি দিলে তা নিয়ে রীতিমতো কয়েদিদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বিড়ি গ্রহণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে যে গোপনীয়তা রক্ষিত হয় তা নিয়োগ পরীক্ষার কর্তার অনুসরণীয় হতে পারে। ফরিদুল ভেবে পায় না, ম্যাট এতো দামি দামি সিগারেট কিভাবে পায়।

একজন নতুন কয়েদি এসেছে গতকাল, নাম বাদল। লিডার গোছের কেউ হবে। কারাগারের সবাই প্রায় তটস্থ তার সেবায়। ছোট সাইজের বোতলে কি যেন খায়। এখানে এসব কিভাবে আসে?

কি জানি, লাল ঘরের হয়তো অন্য নিয়ম আছে। আরো কিছুদিন থাকলে হয়তো সব জানা যাবে।

জেল সম্রাট ম্যাট সবাইকে ধমক দেয়, তার হুকুম পালনে বাধ্য করে, সবার গোচরে দর্শনার্থী আত্মীয়স্বজনদের বখরা দিতে বাধ্য করে। আচ্ছা ম্যাটকে টাকা না দিলে সে কি করতে পারবে? বাদল কোনো টাকা দেয়নি, অথচ বাদলকে হিসাব করে চলছে ম্যাট। লোকটার নাকি মার্ডার কেস। অবৈধ অস্ত্র পাওয়া গেছে তার কাছে। শোনা যাচ্ছে, দুই একদিনের মধ্যেই ওর জামিন হয়ে যাবে।

ফরিদুলের খুব বাদলের মতো হতে ইচ্ছা করছে, বাদলের চেয়েও বড়, অনেক বড়! কি আশ্চর্য! এমন ইচ্ছা তো কখনো ছিল না আমার। ভাবে ফরিদুল। এখানে আসতেই যদি হয় তাহলে এভাবে কেন? বাদল তো আটকানো থাকবে না। অথচ ফরিদুল আছে আজ প্রায় মাস খানেক। আরো হয়তো বেশ কিছুদিন থাকতে হবে। বিরাট এক পাথর চেপে বসে বুকে, ঘুম ছুটে যায়। ফরেস্টারের অভিযোগ সত্যিই বাস্তবায়িত করার দুর্নিবার কল্পনা কিলবিল করে ওঠে মাথায়।

ফরিদুলের বাড়ির পুবপাশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধের দুই ধারে বনায়নের জন্য গাছ লাগায় বন বিভাগ। পাচ বছরের মধ্যে আলগা মাটিতে গাছ তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে।

গ্রামের লোকজন মাঝে মধ্যে খড়ি করার জন্য দুই একটা করে ডাল কেটে নিয়ে যায়।

প্রতিবাদী হয়ে ওঠে ফরিদুল। তাদের ধমক দেয়। এবার যদি কেউ গাছের ডাল কাটে তাহলে ফরেস্ট অফিসারকে জানিয়ে দেবো।

তার ধমকে কাজ হয়। ফরিদুল গ্রামের লোকজনকে বোঝাতে সক্ষম হয়, গাছগুলো আমাদেরই উপকারের জন্য। বিরান এ ভূমিতে গাছ লাগিয়ে যত্ন–আত্মি করে বড় করে সবুজে শ্যামলে পূর্ণ করাটা সত্যিই দুষ্কর। সরকারের এ ভালো কাজে সহযোগিতা করা দরকার।

গ্রামবাসী ফরিদুলের যুক্তি মেনে নেয়।

কিছুদিন যেতে না যেতে দুই একটি করে গাছ রাতের বেলা চুরি যেতে থাকে। হঠাৎ হয়তো সকালে উঠে দেখা গেল ডালপালা পড়ে আছে, গাছের গুড়ি নেই। গ্রামবাসী তাজ্জব হয়ে যায়। কারা করছে এসব!

কেয়ারটেকার খায়রুলকে জিজ্ঞাসা করলে সে জবাব দেয়, রিপোর্ট করেছি, অজ্ঞাত লোক গাছ কাটে রাতের বেলা, চিনতে পারি না।

বিষয়টা ফরিদুলকে ভাবিয়ে তোলে। কোথাকার অজ্ঞাত লোক কেটে নিয়ে যাচ্ছে গাছ? এমন সুন্দর গাছগুলো এভাবে শেষ হয়ে যাবে? কিছুই কি করার নেই? গ্রামের পাচ ছয়জন জওয়ান ছেলে নিয়ে পাহারা বসায় ফরিদুল, গোপনে। গাছ চোর ধরতে হবে। গাছ চোর ধরা অভিযান।

ঘুট ঘুট নিঃসীম অন্ধকার রাত। নিঝুম নিস্তব্ধ পৃথিবী। চারদিকে কোনো সাড়া নেই শুধু ঝিঝির সুর বদলানো ডাক ছাড়া।

হঠাৎ ফরাশ করাত চালানোর শব্দে সচকিত হলো ফরিদুলের দল। যথাসম্ভব শব্দপানে এগিয়ে একশ গজ সীমানার মধ্যে এসে শব্দের উৎপত্তিস্থলে হঠাৎ তিনটি টর্চ একসঙ্গে প্রতিফলিত করলো ফরিদুলরা। হুড়মুড় শব্দে লাফিয়ে ওঠে গাছকাটা অস্ত্রসস্ত্রসহ ছুট দিল চোর দলের ছয় সাতজন লোক।

ফরিদুল দলবলসহ তাদের ধাওয়া করলো। টর্চ স্থির রেখে ফরিদুর হঠাৎ থমকে দাড়িয়ে পড়লো।

আজহারুল জিজ্ঞাসা করলো, কি হলো? ধরা যাবে তো, চল ধরে ফেলি।

লাল শার্ট পরা লোকটাকে চিনতে পারছো?

আমার তো ওকে খায়রুলের মতো লাগলো।

তাই তো। আমারও তাই মনে হলো। থাক আর তাড়ানোর কাম নেই, চল ফিরে যাই।

দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ফরিদুল সেদিনের মতো তার দলবলসহ ফিরে আসে।

পরদিন উপজেলা সদরে ফরেস্টারের বাসায় গিয়ে ফরিদুল বিস্তারিত ঘটনা তাকে বলে দেয়। কেয়ারটেকার খায়রুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাসহ, গাছগুলো রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানায়।

ভেতরে কার যেন পরিচিত কণ্ঠের হাসির শব্দ শুনতে পায় ফরিদুল। ঠিক বুঝতে পারে না। চলে আসে ফরেস্টারের বাসা থেকে।

এক সপ্তাহ যেতে না যেতে একদিন হঠাৎ পাচজন পুলিশ গিয়ে ফরিদুলকে ধরে নিয়ে আসে। কোর্টে চালান দেয়ার আগে ফরিদুলকে থানার দারোগা হেলাল সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, *চালান দিমু, না, এখন থাইকাই জামিন লইবার চাও?*

ফরিদুল আশান্বিত হয়। আমতা, আমতা করে বলে, এখান থেকে জামিন দিলে তো ভালোই হয়। আমি তো নিরপরাধ।

কিন্তু তোমার তো কোনো লোক আইলো না? আলাপ আলোচনা করন লাগবো না? তোমার বাবারে এমাউন্ট বইলা দিছি, হের তো হেইথ ন পাত্তা নাই।

এমাউন্ট। কতো বলছেন স্যার?

বেশি না। যা কেস, দশ হাজারেই ডিসমিস অইয়া যাইতো।

ফরিদুলের কপাল জড়ো হয়ে যায়। মিটমিট করে বলে, আপনি চালান করে দেন স্যার। বাবা বোধহয় আসতে পারবেন না।

দারোগা বলেন, *এই জন্যেই তো তোরা ফাইস্যা যাস। বোজস বেশি। কিন্তু হিসাবটা ঠিক করবার পারস না। ঠিক আছে, বুজবা।*

পরদিন প্রায় বিশটি গাছ চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে ফরিদুলকে কোর্টে চালান দেয়া হলো। পুরো সময়টা ফরিদুল নির্বাক হয়ে শুধু চেয়ে দেখতে থাকে। বৃদ্ধ বাবার অসহায় বোবা চাহনি তাকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। ফরিদুল বিস্মিত হয়ে শোনে, এই মামলায় বাদী ফরেস্টার স্বয়ং আর সাক্ষী কেয়ারটেকার খায়রুল। মামলার আরজিতে ফরিদুলকে দুর্ধর্ষ ডাকাত আর সন্ত্রাসী হিসেবে উল্লেখ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন ফরেস্টার।

ফরিদুলের বুক ফুড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। কেয়ারটেকার খায়রুলের ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ আছে। কিন্তু ফরেস্টারের এ আচরণের কারণ খুজে পায় না ফরিদুল। নাকি সবার হিসাবই ঠিক আছে, তার নিজের হিসাবেই কোনো ভুল হয়ে গিয়েছিল।

গতকাল ফরিদুলের বাবা এসে দেখা করে বললেন, তিনি ফরেস্টারের কাছে গিয়েছিলেন ফরিদুলের প্রতি মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাহার করার অনুরোধ করতে।

ফরেস্টার বলেছেন, বিশ হাজার টাকা হলে থানার সঙ্গে আলাপ করে চার্জশিট থেকে নাম বাদ দেয়া যাবে।

বাবা চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বিশ হাজার টাকা?

হ্যা। এটা ফিক্সড রেট। এ মামলায় এর কমে কাজ হয় না। এখন চাইলে চার্জশিট যাওয়ার আগেই টাকা নিয়ে আসবেন।

ফরিদুল চমকে উঠেছিল কথা শুনে *ফিক্সড রেট*। পসরা তো ভালোই। তার মানে, ব্যবসা বেশ চালুই আছে। গ্রামের বাদাম বিক্রেতা ফেরিওয়ালার মতো *পাটেও লাভ, বুটেও লাভ*। যতো গাছ কাটা ততো টাকা। কতো সহজ অংক। অথচ আমি মেলাতেই পারছিলাম না।

ফরিদুলের খুব জানতে ইচ্ছা করে, কাটা গাছগুলোর পসরা কোথায় বসে? কেয়ারটেকারের বাড়িতে, না ফরেস্টারের আখড়ায়।

শুধু প্রকৃতির পরিবেশ রক্ষা করলে তো চলে না, পকেটের পরিবেশও রক্ষিত হতে হয়।

রক্ষী আবার হাকায় *ছিয়ানব্বই জমা, তিন নম্বর, আবার গুণতি ধর।*

ফরিদুলের চোখ জ্বলে ওঠে। রক্ষী যেন জানান দেয়, হিসাবটা ঠিক রাখতে হয়।

জলঢাকা, নীলফামারী থেকে

Yes No

– রুহুল আমিন

হঠাৎ করেই আমাদের বাড়িতে তার আগমন।

নাম Yes No (Yes-হে No-না) মানে হেনা।

যদিও সম্পর্কে আমার ফুপাতো বোন তবুও জন্মের পরে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। এই প্রথম সে আমাদের বাড়িতে এলো।

আমরা, বিশেষ করে আমি কোনোদিন ওদের বাড়ি যাইনি। শুধু বাবার কাছে মাঝে মধ্যে ওদের গল্প শুনতাম।

অনেক দিন পর আমাদের বাড়িতে এসে জানি না কি মনে করে ফুপু Yes No–কে আমাদের বাড়িতে রেখে গেল। ওকে এখানকার স্কুলে ক্লাস নাইনে ভর্তি করে দেয়া হলো।

আমি অনার্সে পড়ি। ওর লেখাপড়ার গুরুদায়িত্ব পড়লো আমার হাতে।

কিছুদিনের মধ্যেই ও আমাদের বাড়ির সবার মন জয় করে ফেললো।

আমাদের কোনো বোন ছিল না। ফলে সবার কাছে মিশে গেল খুব সহজে। সবার মন জয় করলেও ব্যতিক্রম ছিল আমার ক্ষেত্রে। আমি ওর মন জয় করতে উঠে–পড়ে লেগে গেলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না।

ও এমন সব কাণ্ড করতো, বুঝতে পারতাম না ও আমাকে চায় কি না।

আমিও কোনো সময় জোর করতাম না। ভাবতাম ও তো আমাদের বাড়িতে আমার কাছেই আছে।

ও যে চলে যাবে এ কথা কোনোদিন স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। ও এসএসসি পরীক্ষা দিল। পাস করলো। আমাদের এখানে কলেজে ভর্তি হবে। এই সময় হলো বিপত্তি।

ফুপু আর বাবা কি যুক্তি করে ওকে ওদের বাড়িতে পাঠিয়ে ছিলেন। যাওয়ার পর গোপন সূত্রে প্রকাশ, আমরা দুজন একই সঙ্গে থাকলে দুজনের নাকি ভবিষ্যৎ নষ্ট! তবে যাওয়ার সময় ও ছোট্ট একটি চিঠি দিয়েছিল যার ভাষা এ রকম–

আমি আপনাকে ভালোবাসি। খুব ভালোবাসি। আমার মনের ভেতর ভালোবাসার একটি পাখি বাস করে যার মুখ থেকে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত আমি আপনাকে চাই, আপনাকে ছাড়া আমি বাচবো না। এ কথাটি বলতে চেয়েও বলিনি। কারণ আপনার বাবা মায়ের কাছে নিজে ছোট হতে চাইনি আর আপনাকেও ছোট করতে চাইনি। আপনি অনেক দিন শুধু জানতে চেয়েছেন হয়তো Yes, নয়তো No। আজ বলছি, সারা জীবনের জন্য আমার মন, প্রাণ, দেহ আপনার জন্য Yes.

ওর বাড়ি দক্ষিণ বাংলায়, আমার বাড়ি গাজীপুর। এ বছর ও এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। এখন প্রতিদিনই মোবাইলে যোগাযোগ হয়। আশা আছে সামনের বছর Yes No–কে একটা লাল শাড়ি কিনে দেবো।

শ্রীপুর, গাজীপুর থেকে

আসলি

– শামশুল আলম

মধ্যপ্রাচ্যে সউদি আরবে আছি অনেক দিন ধরে। এখানে সউদিদের বিচিত্র আচরণে এবং দেশ ভেদে বিভিন্ন রকম ব্যবহারে বলতে গেলে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

সউদিয়ানরা আমাদের সঙ্গে, বিশেষত বাঙালি, ইনডিয়ান, পাকিস্তানিদের প্রতি যে বিরূপ ব্যবহার করে তা তাদের সমগোত্রীয় বা স্বভাষীয় ইয়েমেনি, ইজিপশিয়ানদের সঙ্গে করে না। আমাদের মিসকিন (গরিব) মনে করে তারা যে ব্যবহার করে, আমাদের চেয়ে অনেক গরিব ইয়েমেনিয়দের সঙ্গে সে রকম করে না। কারণ তাদের ভাষা আরবি হওয়াতে তারা যে কোনো কিছুর উপযুক্ত জবাব দিতে পারে।

তবে সব সউদিয়ান এক রকম নয়। এখনো অনেক সউদিয়ান আছে যারা আমাদের মুসলমান এবং মানুষ হিসেবে দেখে।

কিছুদিন আগে আমার পাশের দোকানে দুটি সউদি মহিলা আসেন যাদের বয়স আনুমানিক পনের ষোল বছর হবে। এখানে বলা প্রয়োজন, আমাদের দোকানে শুধু মহিলাদের ব্যবহারের জিনসপত্র বিক্রি করা হয়।

দোকানদার বকুলভাই যাকে আমরা খাদ্যমন্ত্রী বলে ডাকি তার সঙ্গে মহিলাদের একজন কথা প্রসঙ্গে বললো, *এনতা তবসা আনা* (তোমার কি আমার দরকার হবে)?

মন্ত্রী আমাকে ডেকে বললো, *হুয়া বসা এনতা* (তোমাকে তার দরকার)।

বললাম, *আইওয়া আনা বসা এনতা* (হ্যা, তোমাকে আমার দরকার)।

মহিলাটি আবার বললো, *কাম ইস্ত্রি এনতা আনা* (কতো দিয়ে তুমি আমাকে কিনবে)?

বললাম, *এনতা কাম সোল* (তুমি বলো কতো)?

সে বললো, *হামছিন আলফ রিয়াল* (পঞ্চাশ হাজার টাকা)।

বললাম, *হামছিন আলফ রিয়াল যেইয়াদা* (পঞ্চাশ হাজার টাকা বেশি)।

এনতা জদিদ লা মুসতামেল (তুমি নতুন, না ব্যবহৃত)?

মহিলা বললো, *আনা মমাররা আসলি জদিদা* (আমি একদম খাটি এবং নতুন)।

বললাম, *আনা কেইপ আরব এনতা জদিদা আসলি* (আমি কেমন করে জানবো তুমি খাটি এবং নতুন)?

এবার আমার অবাক হওয়ার পালা।

মহিলা বললো, *আনা কোললু গোমাস পককু বাদিন এনতা সোপ আনা আসলি লা না* (আমি আমার সব কাপড় খুলবো, তারপর তুমি দেখবে আমি খাটি কি না)।

আমি এবং মন্ত্রী মহিলার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম।

সে বললো, *এনতা আসলি লা মুসতামেল* (তুমি খাটি, না ব্যবহৃত)?

এরপর মহিলা দুটি হাসতে হাসতে চলে গেল।

আমরা তাদের চলে যাওয়ার দৃশ্যটি দেখলাম। শেষে অন্য মহিলা কাস্টমারের ডাকে সংবিৎ ফিরে পেলাম।

সউদি আরব থেকে

দেশ বিদেশের ট্রেন

– ড. নুরুল আমিন ইকবাল

ছোটবেলার অনেক স্মৃতির মাঝে ট্রেন চড়ার স্মৃতি এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে। স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হলে শুধু অপেক্ষায় দিন গুণতাম কবে নানার বাড়ি বেড়াতে যাবো। বলার অপেক্ষা রাখে না, আগ্রহের প্রধান কারণ ছিল ট্রেনে চড়া। নানার বাড়ি যেতে হলে ট্রেনই ছিল একমাত্র মাধ্যম।

আমরা তখন ছিলাম নারায়ণগঞ্জ। কমলাপুর স্টেশন থেকে সে সময়ের সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেন *উলকা*–য় চড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত যেতে হতো। উলকায় চড়ার বোনাস হিসেবে থাকতো সে সময়ের নান্দনিক সৌন্দর্যের বিশাল কমলাপুর স্টেশন।

ছোটবেলা শুনতাম, কমলাপুর স্টেশন পাকিস্তান তথা এশিয়ার সবচেয়ে বড় স্টেশন। আমরা তখন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী হয়ে খুব গর্ব করতাম, পশ্চিম পাকিস্তানেও আমাদের মতো এতো বড় রেল স্টেশন নেই।

উলকা যখন তার গতি নিয়ে ভৈরবের মেঘনা বৃজ পার হতো তখন ভয়ে গা ছম ছম করতো। আম্মাকে জড়িয়ে ধরে বিশাল মেঘনা নদী আর বৃজের সৌন্দর্য দেখতাম। এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে

আওয়ামী লীগের জয়জয়কার এবং নির্বাচনের সময় একটা জনপ্রিয় স্লোগান ছিল, *শেখ মুজিবের নৌকা, চলছে এবার উলকা*। সত্যি সে সময়ে উলকায় চড়ার স্মৃতি এখনো উজ্জ্বল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর উলকা তার শ্রী হারাতে থাকে এবং উলকা-র চেয়ে আরো দ্রুতগামী *সমতা, কর্ণফুলী এক্সপ্রেস* ইত্যাদি ট্রেনের আবির্ভাব হয়। তবে বাংলাদেশে ট্রেনের মাইলফলক হচ্ছে স্বৈরশাসক এরশাদের সময় উন্নতমানের আন্তঃনগর *ট্রেন মহানগর, পদ্মা, তিস্তা* ইত্যাদি প্রচলনের মাধ্যমে। আন্তঃনগর ট্রেনের সেবার মানও ছিল আগের চেয়ে অনেক উন্নত।

মনে পড়ে, ইউনিভার্সিটি লাইফে আমরা বন্ধুরা একজোট হয়ে ট্রেনে প্রথম শ্রেণীতে চড়ে ময়মনসিংহ যেতাম বিনা টিকেটে। কিন্তু আন্তঃনগর ট্রেন শুরু হলে রীতিমতো অগ্রিম টিকেট কেটে রাখতাম। টিকেট পাওয়া মানে আসনেরও নিশ্চয়তা। এছাড়া ট্রেনের ভেতরের পরিবেশ ভ্রমণের আনন্দটাই বাড়িয়ে দিতো।

বাংলাদেশের ট্রেনে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা যেমন শেডিউল অনুযায়ী ট্রেন না ছাড়া, অপরিপচ্ছন্ন পরিবেশ, ফেরিওয়ালা ও ভিক্ষুকের উৎপাত ইত্যাদি থাকলেও দূরপাল্লার ভ্রমণে বাসের চেয়ে ট্রেন অনেক নিরাপদ এবং অবশ্যই উপভোগ্য।

১৯৯৬ সালে উচ্চ শিক্ষার্থে জাপানে আগমন। জাপানে আসার পর ট্রেনই হলো প্রতিদিনের যাতায়াতের মাধ্যম। জাপানিজ ভাষায় ট্রেনকে বলে *দেনশা*। জাপানে ট্রেনের নেটওয়ার্ক খুবই বিস্তৃত এবং বিভিন্ন কম্পানি ট্রেন ব্যবস্থাপনায় জড়িত। এখানে আছে JR, Hankyu, Hanshin, Keihan ইত্যাদি ছাড়াও আরো অনেক কম্পানির ট্রেন। বিভিন্ন ট্রেনের আছে সুন্দর ব্যবস্থাপনা, সেবার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা। এর মধ্যে জেআর নেটওয়ার্ক সমস্ত জাপানে বিস্তৃত। *বুলেট ট্রেন বা শিনকানসেন* হচ্ছে জেআর ট্রেন। জাপানের ট্রেন ব্যবস্থা যে কোনো দেশের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে।

জাপানের ট্রেনে আমাদের দেশের মতো আলাদা কোন ক্লাস নেই। শুধু বুলেট ট্রেনে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। এছাড়া ট্রেনের ভেতর রয়েছে বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীদের আলাদা সিট যা খালি থাকলেও অন্য যাত্রীরা সাধারণত ব্যবহার করেন না। ট্রেনে ধূমপান নিষিদ্ধ। তবে বুলেট ট্রেনে স্পোকারদের জন্য রয়েছে আলাদা বগি। এছাড়া বুলেট ট্রেনের ভেতর কয়েন টেলিফোনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

১৯৯৬-র গোল্ডেন উইকের ছুটিতে প্রথম বুলেট ট্রেন ভ্রমণের সুযোগ হয়। ওসাকা থেকে ইয়োকোহামা যাচ্ছিলাম। যদিও তিনশ কিলোমিটার গতি ট্রেনের তবুও আড়াই ঘণ্টার জার্নি। ভাবছিলাম সিনেমার গল্পের মতো হঠাৎ যদি কোনো নায়িকার আবির্ভাব হয়, ইশ! তাহলে কি মজাই না হয়, জাপানিজ ভাষায় না পারলেও ইশারা-ইঙ্গিতে তো মনের কথা প্রকাশ করতে পারতাম। না নায়িকার আবির্ভাব হয়নি। তবে আমার পাশের যাত্রী সুন্দরী তন্বী, জাপানিজ তরুণী থাকলেও আমরা যে যুগ যুগ ধরে অচেনা।

না খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। দেশ থেকে স্ত্রী চলে আসাতে টোকিও-হিরোশিমা এক সঙ্গে বুলেট ট্রেনে ভ্রমণ করেছি। গল্পের নয়, বাস্তবের নায়িকা পাশে থাকাতে এবার যেন বুলেট ট্রেনের জার্নি যথার্থ পরিপূর্ণতা পেল।

জাপানে বুলেট ট্রেনের প্রচলন শুরু হয় ১৯৬৬ সালে। যদিও এর গতি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এখনকার মতো ছিল না। বর্তমানে পাচশ কিলোমিটার গতিবেগের বুলেট ট্রেন শুরু হওয়ার অপেক্ষায়। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে ভবিষ্যতের বুলেট ট্রেন কেমন হবে তা কল্পনাবিলাসীরা ভাবতে পারেন কি?

ছিমছাম, ছোট্ট সুন্দর দেশ বা শহর সিংগাপুর। ১৯৯৮ সালে সিংগাপুরে যাবার সুযোগ হয়। সিটিতে ট্যাকসি ক্যাবের পাশাপাশি ট্রেন হচ্ছে অন্যতম মাধ্যম। সিংগাপুরে ট্রেন সার্ভিসকে বলা হয় *এমআরটি*। ট্যাকসির চেয়ে ট্রেনে ডলার এবং সময় সাশ্রয় হওয়ার কারণে অনেকেই ট্রেনকে বেছে নেয়।

সিংগাপুরে সারা বছরই প্রচুর টুরিস্ট বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে গিয়ে থাকে। জুড়ং বার্ডপার্ক হচ্ছে তেমনি একটি দর্শনীয় স্পট যার স্মৃতি এখনো অমলিন। জুড়ং বার্ডপার্কের ভেতরে আছে মনোরেলের ব্যবস্থা। বার্ডপার্কের

ভেতর পাচ ডলারে মনোরেলে চড়ে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য দর্শন এক কথায় অপূর্ব। এসব সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্যই সিংগাপুরে সারা বছর টুরিস্টের আনাগোনা লেগেই আছে এবং পর্যটনের সমৃদ্ধিতে অর্থনীতির ভিতও মজবুত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

২০০২ সালে উচ্চ শিক্ষা শেষ করে আমেরিকা বেড়াতে যাই স্ত্রীসহ। বিশাল বড় দেশ হওয়ার কারণে আমেরিকায় ট্রেনের নেটওয়ার্ক জাপানের মতো নয়। অবশ্য নিউ ইয়র্কের অবস্থা ভিন্ন। এখানে আছে সার্বক্ষণিক সাবওয়ে বা পাতালরেল। আমেরিকার সাবওয়ে শতাধিক বছরের প্রাচীন। আমার বন্ধু আমিনুল বেশ গর্ব করে সাবওয়ে করে আমাদের *স্ট্যাচু অফ লিবার্টি* দর্শনে নিয়ে যায়। নিউ ইয়র্কের সাবওয়েতে ঢুকলেই কেমন যেন ভয় ভয় করে।

আমেরিকার দূরপাল্লার ট্রেনের মধ্যে নিউ ইয়র্ক থেকে কানাডার টরন্টোগামী ট্রেন চড়ে নায়াগ্রা ফলস দেখতে যাবার সুযোগ হয়েছে। প্রায় আট ঘণ্টার জার্নি, বিভিন্ন স্থানে অনেক স্টপেজ। কিন্তু স্টেশনের চেহারা দেখলে মনে হয় যেন কোনো গরিব দেশের স্টেশন। তবে দীর্ঘ ভ্রমণে সবচেয়ে ভালো লেগেছে ট্রেনের জানালা দিয়ে বিশাল বনরাজি দর্শন। ছোটবেলায় ভূগোলে পড়তাম চিরহরিৎ অরণ্য। এর যেন শেষ নেই। তবে আমাদের জন্য চমক অপেক্ষা করছিল নায়াগ্রা থেকে ফেরার পথে।

ট্রেনের জন্য ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছি। অনেকটা আমাদের দেশের জেলা শহরের স্টেশনের ওয়েটিং রুমের মতোই সাধারণ মানের। ট্রেনের সময় হলে যাত্রীদের প্ল্যাটফর্মে যাবার জন্য বলা হলো। প্ল্যাটফর্ম বলতে একটু পাকা জায়গা, উপরে ছাউনি পর্যন্ত নেই। তুষারপাতের মধ্যে খোলা জায়গাতেই অপেক্ষা করছি।

ট্রেন থামলে একজন কর্মচারী এসে দরজার পাশে একটা প্লাস্টিকের সিড়ি রাখলো। এ ধরনের সিড়ি আমাদের দেশে রাজনৈতিক মিটিং-এর জন্য অস্থায়ী মঞ্চে ওঠার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে।

আমরা সিড়ি বেয়ে ট্রেনে চড়লাম। পৃথিবীর একমাত্র সুপারপাওয়ারের দেশে ট্রেনে ওঠার সিড়ির কথা মনে হলে মনের অজান্তে হেসে উঠি।

জাপান থেকে

বিশ্বাসঘাতক

– সাদিক

মইন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দীর্ঘ দশ বছর পর সে যখন নিউ ইয়র্ক থেকে দেশে আসে তার পরিবারের সবার দাবি বিয়ে করতে হবে। চারদিকে কনে দেখা শুরু হয়ে যায়।

ডজন খানেক মেয়ে দেখার পরও যখন কোনো মেয়ে পছন্দ হচ্ছিল না, মইন খুব হতাশা নিয়ে আমাকে বলে, আমার হয়তো বিয়ে করা হবে না। আমি আবার দেশান্তরি হবো।

একদিন বিকেলে আমার বাসায় গল্প করছিলাম। এমন সময় শফিকভাই ফোন করে মইনের বিয়ের ব্যাপারে জানতে চাইলেন। আমার কথা শুনে শফিকভাই বললেন, আমার চেনা জানা একজন মেয়ে আছে, তোমাদের আপত্তি না থাকলে শেষবারের মতো তাকে দেখতে পারো।

শফিকভাইকে বললাম, মইনের সঙ্গে আলাপ করে কিছুক্ষণের মধ্যে তার সিদ্ধান্তের কথা আপনাকে বলবো।

মইনের সাফ কথা, সে আর কোনো মেয়ে দেখবে না।

মইনকে অনুরোধের সুরে বলি, দেখ, শফিকভাই একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি যখন নিজ থেকেই বলছেন, শেষবারের মতো একবার চেষ্টা করে দেখি না।

অনেক জোরাজুরির পর সে রাজি হয়।

শফিকভাইকে বললাম, মাগরিবের নামাজ শেষে আমরা আপনার দেয়া ঠিকানায় পৌছাবো। আপনি থাকবেন।

নামাজ শেষেই আমরা মেয়ের বাসায় পৌছি।

শফিকভাই মেয়ের নানার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

নানা বেশ আলাপি। অল্পতেই আমাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল।

মইনকে আজ কেন যেন একটু বেশি উৎফুল্ল মনে হচ্ছে। আমি তাকে বলি, দোস্ত, আমি নিশ্চিত, এই মেয়ের সঙ্গে তোর নিকা হবে।

আলাপের ফাকে নানা যেন কাকে আসতে বললেন।

মইনকে বললাম, তুই মানসিকভাবে তৈরি থাকিস। সম্ভবত মেমসাহেব দর্শন দেবেন।

মিনিট পাচেক পর খুব সাধারণ পোশাকে প্রসাধন বিহীন খুব মায়াবতী একজন মেয়ে সালাম করে রুমে ঢোকে। আমি যন্ত্রচালিতের মতো বসা থেকে দাড়িয়ে যাই এবং অবাক দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখতে থাকি। শফিকভাইয়ের কথায় কোনো রকমে চেয়ারে বসি। মাঘের হাড় কাপানো শীতেও আমি ঘেমে জবুথবু।

মাথা নিচু করে মেয়েটি মইনের সঙ্গে কথা বলছে।

এক পর্যায়ে নানাকে নিয়ে শফিকভাই বাইরে যান।

মইন দেখি এ সুযোগটা ভালোই কাজে লাগাচ্ছে।

রুমে প্রবেশের পর থেকে একটি ব্যাপার খেয়াল করছি, মেয়েটি একবারও আমাদের চেহারার দিকে দৃষ্টি দেয়নি।

তাকে বললাম, মেমসাহেব, আপনি কি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বিরক্ত বোধ করছেন?

মেমসাহেব খুবই অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখুন মিস্টার আমি খুবই অসুস্থ। আমার আচরণে যদি কোনো গলদ থাকে মাফ করবেন।

কিছুক্ষণ পর শফিকভাই আর নানা রুমে আসেন।

এক পর্যায়ে নানা মইন থেকে জানতে চাইলেন নাতি পছন্দ হয়েছে কি না।

মইন বললো, আপনার নাতির মত থাকলে আমি এখনই কাজি সাহেবের কাছে যেতে রাজি।

নানা আল্লাহ পাকের কাছে শুকরিয়া আদায় করলেন।

মইন কনেকে আংটি পরিয়ে দেয়ার পর আমরা চলে আসি।

পরের দিন মইনের আম্মা বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করেন। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ওদের বিয়ে হয়ে যায়।

পাঠকদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, এখন আমার নিজের কথা শুনতে হবে।

মইনের বৌকে *মেমসাহেব* নামে ডাকি। এই সেই মেমসাহেব যাকে দীর্ঘ দুই বছর আগে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে দেখে আমরা পাচ বন্ধু এক সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলাম। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ভালোবাসা দিয়ে যে কেউ তাকে যদি প্রেমিকা হিসেবে পায় তাহলে কারো আপত্তি থাকবে না। এক সময় দেখি আমার বন্ধুরা সবাই মেয়েটিকে ভুলে গেছে। কিন্তু আমি ভুলতে পারিনি। আমি সব সময় চাইতাম তার সঙ্গে আমার দেখা হোক। কলেজ, মার্কেট, বিচ, সবখানে তাকে খুজতাম। আমার এমনই মন্দ ভাগ্য, দীর্ঘ দুই বছরে একটিবারও তার সঙ্গে দেখা হয়নি। নিয়তির কি অদ্ভুত খেলা। এখন পায়ে হাটার দূরত্বে তার–আমার অবস্থান।

হঠাৎ একদিন আমার বাসায় মেমসাহেব ফোন করেন। অভিযোগের সুরে বলেন, এতো আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের বিয়ের সব কিছু করলেন। সপ্তাহ না পেরুতেই দেখি আপনি অন্য মানুষ। আমার খবর না হয় নিলেন না, অন্তত মইনের খোজখবর তো একবার নিতে পারতেন। ভুলে যাচ্ছেন কেন আপনি তো মইনের সব কিছুর পরামর্শদাতা। বিয়ের পর বন্ধুর পরামর্শ, সহযোগিতা বেশি প্রয়োজন, আর সব সময় মনে রাখবেন, আপনার জোরাজুরিতেই মইনের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়।

আমার কোনো কথাই তিনি শুনছিলেন না।

হঠাৎ যেন বোমা ফাটার শব্দ শুনলাম। আপনি কি জানেন, বর হিসেবে আপনিই ছিলেন আমার প্রথম পছন্দ? খুব স্মার্ট একজন ছেলে আপনি। কিন্তু আমার চোখের ভাষা বোঝার ক্ষমতা বিধাতা আপনাকে দেয়নি। এই দুঃখ বোধটা আমাকে আজীবন তাড়া করবে।

হতবাক হয়ে যাই। তিনি যখন বলেন, দুই বছর আগে কোন ড্রেস পরে আমার সঙ্গে সেই পারিবারিক অনুষ্ঠানে প্রথম দেখা, তখন আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। তাকে বললাম, এসব খেয়ালি বাদ দিয়ে পতিসেবা করেন।

এমন সময় তিনি বললেন, শাশুড়ি আম্মার সঙ্গে কথা বলেন।

মইনের আম্মা আমাকে বললেন, আগামীকাল সকাল দশটায় বৌকে নিয়ে তার বাপের বাড়ি যাবো তৈরি থাকিস।

পরের দিন মেমসাহেবের বাসায় পৌছার পর তাকে বললাম, ক্লান্ত বোধ করছি। শোবার ব্যবস্থা করেন।

মইন আসেনি বলে তার ফ্যামিলির সবার মন খারাপ।

বিছানায় শুয়ে পত্রিকা পড়ছি। এমন সময় মেমসাহেব রুমে আসেন আর আমাকে হতবাক করে বলেন, আপনার সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হতো, পৃথিবীর মানুষের কি খুব বেশি ক্ষতি হতো? হায় আল্লাহ, কেন যে এমন হলো।

তাকে বললাম, আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, এমন কোনো আচরণ করবেন না যাতে মইন আর আমার মাঝে দেয়াল সৃষ্টি হয়। মনে রাখবেন, আপনার শাশুড়ি আমাকে নিজের ছেলে হিসেবে দেখেন। আর আমার হৃদয়ে আপনার স্থান এতো গভীরে যে, পৃথিবীর কেউ ওখান থেকে সরাতে পারবে না।

মেমসাহেব বললেন, জানেন, সুযোগ পেলেই বিচে গিয়ে আপনাকে খুজতাম। ভাবতাম, কক্সবাজারের ছেলে হিসেবে আপনি নিশ্চয় বিচে যান।

তাকে বললাম, এসব কথা পরে শুনবো। আপনি এখন যেতে পারেন।

মেমসাহেবকে সাত মাসের গর্ভবতী অবস্থায় রেখে আমাকে তার দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে মইন আবার নিউ ইয়র্ক চলে যায়।

মেমসাহেবকে যখন চেকআপের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতাম তখন খুবই নাজুক অবস্থায় পড়ে যেতাম। পরিচিত কেউ দেখলেই এসে জিজ্ঞাসা করতো কবে বিয়ে হয়েছে বৌয়ের বাড়ি কোথায় ইত্যাদি। অনেক সময় তিনি এমন কিছু আচরণ করতেন যে মনে হতো সত্যিই আমি তার স্বামী।

ডাক্তারের দেয়া নির্দিষ্ট তারিখে মেমসাহেব মা হন। হাসপাতালের নার্সরা আমাকে ঘিরে ধরলেন বখশিশ পাওয়ার আশায়। ওনারা ভাবতেন আমি স্বর্গীয় একজন শিশুর গর্বিত পিতা।

মেমসাহেব মা হওয়ার পর তার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করি। দুই তিন মাস পর ফোনে সৌজন্যমূলক কথাবার্তা হলো। আমার ভীষণ কষ্ট হতো তার বাচ্চাটাকে দেখতে পেতাম না বলে।

একদিন মইন ফোনে বললো, তোর ভাবীর পাসপোর্টটা করে রাখবি। আমি ভিসার ব্যবস্থা করছি।

পাসপোর্ট করতে গিয়ে দেখি মেমসাহেব আমার চেহারার দিকে তাকাচ্ছেন না। ভালো করে কথা বলছেন না।

আমিও ক্ষমা প্রার্থনা করি তার সঙ্গে যোগাযোগ না রাখার জন্য। এই প্রথম প্রেমিকের মতো বলি, এই পাগলি, যোগাযোগ রাখিনি বলে কি মনে করেন আপনাকে হৃদয় থেকে মুছে ফেলেছি? ভুলে যাবেন না দীর্ঘ দুই বছর আপনাকে না দেখে, কথা না বলেও আমি প্রতিদিন আপনাকে পূজা করতাম।

আমার কথা শুনে মেমসাহেব কেমন যেন হয়ে যান।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার জন্য পাসপোর্ট সম্পর্কিত আলাপ শুরু করি।

শাহনুর আলম নামে একজন ডিবি অফিসার মেমসাহেবের পাসপোর্টের তদন্ত করতে এলে প্রশাসনের নোংরা এক চেহারা দেখতে পাই। মেমসাহেব খুব কম কথার মানুষ। অফিসার অপ্রয়োজনীয় এমন কিছু প্রশ্ন করছিলেন যাতে তিনি বিরক্ত হয়ে পড়ছিলেন। সে অজুহাতে শাহনুর সাহেব তদন্ত শেষ না করেই চলে যান।

পরে মোটা অংকের ঘুস দিয়ে তদন্ত রিপোর্ট আদায় করি।

শাহনুরের আচরণে এতোটাই বিরক্ত হই, তার সূত্র ধরে মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করি। এক পর্যায়ে তার গালে জোরে একটা চড় মারি। আমার এমন আচরণে আমি নিজেই হতবাক হয়ে যাই।

মেমসাহেব দেখি মিটি মিটি হাসলেন এবং খুবই মোহনীয় ভঙ্গিতে বললেন, আজকের দিনটি আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার খুব কাছে বসে আরো বললেন, জানেন, দুই দিন খুব ভাবছি পাসপোর্ট, বিদেশ যাওয়া এসব বাদ দিয়ে আমি সারা জীবনের জন্য আপনার কাছে চলে গেলে কেমন হয়?

তার কথার কোনো গুরুত্ব না দিয়ে বললাম, আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। দুই মাসের মধ্যেই আপনার স্বামীর কাছে যাবেন। ওখানেই গেলেই আপনার সব সমস্যার সমাধান হবে।

এরপর আমি চলে আসি।

এক সময় ভিসা প্রসেসিংয়ের জন্য আমি আর মেমসাহেব ঢাকায় যাই। দীর্ঘ পনেরো দিন আমরা ঢাকায় থাকি। একটি হোটেলে স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে আমরা থাকতাম। সারা দিন অফিশিয়াল কাজকর্ম সেরে যখন রুমে আসতাম তখন মেমসাহেব ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। এই দীর্ঘ পনেরো দিন পনেরো রাত আমার বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য কঠিন এক অধ্যায়। একদিকে আমার বন্ধু, অন্যদিকে পরম পূজনীয় প্রেমিকা। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম, আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকুক, আমি যেন পশু না হই।

একদিন একাডেমি ফিল্ম সোসাইটিতে মেরিলিন মনরো অভিনীত নায়াগ্রা সিনেমাটি দেখতে যাই। সিনেমাতে স্বামীর সঙ্গে নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে যায় এক তরুণী। সে তার প্রেমিকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে কিভাবে স্বামী হত্যা করে সে দৃশ্যটা যখন দেখাচ্ছিল, ওই দৃশ্য দেখে মেমসাহেব আমার হাতটা এতো শক্ত করে ধরে থাকেন আমি কিছুতেই আমার হাত ছড়িয়ে নিতে পারছিলাম না।

সাত দিন পর মেমসাহেবের ফ্লাইট হবে। এ অবস্থায় আমরা বাড়িতে চলে আসি।

তিন দিন পর আমরা আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হই। আগের হোটেলে গিয়ে রুম নিই।

মেমসাহেব বললেন, এখন তো আর দূতাবাসে যাওয়ার তাড়া নেই। যে কয়দিন দেশে থাকবো, আপনাকে সব সময় আমার কথা শুনতে হবে। কোনো অজুহাত শুনবো না।

তাকে নিয়ে আমি নাটক পাড়ায় যাই। লালবাগের কেল্লা দেখতে যাই, নন্দন পার্ক, ফ্যান্টাসি কিংডমে যখন আড্ডা দিই তখন চোখের জল ধরে রাখতে পারি না।

একদিন মেমসাহেব বললেন, আমরা রাজধানীর বিখ্যাত সব জায়গায় ঘুরেছি একটা জায়গা ছাড়া।

জানতে চাইলাম, কোন জায়গা?

তিনি বললেন, আহসান মঞ্জিল।

বললাম, আমি বিয়ে করে যখন হানিমুনে আসবো তখন আমার বৌকে নিয়ে ঘুরবো। তাই আপনাকে নিয়ে ওখানে যাচ্ছি না।

তিনি আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার হাত তার হাতে ধরে বললেন, আপনি কি অস্বীকার করতে পারবেন আমি আপনার বৌ নই?

কোনো কথা বলতে পারি না।

তিনি বলতে থাকেন, কাজি সাহেবের কাছে গিয়ে কবুল বললেই কি বিয়ে হয়ে যায়। হৃদয়ের মিল, অমিলের কি কোনো গুরুত্ব নেই? হ্যা, আপনার সঙ্গে হয়তো কোনোদিন বিয়ের সম্পর্কটা হবে না। তারপরও একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন, আমার হৃদয়ে আপনি থাকবেন সব সময় স্বামীর আসনে আর যদি বেচে থাকি, আপনার বৌকে একটা কথা বলবো, এই মানুষটার অর্ধেক আমার।

এরপর আমরা আহসান মঞ্জিলে যাওয়ার জন্য বের হই।

মেমসাহেব বললেন, রিকশায় বসে আপনার হাত ধরে তবেই আহসান মঞ্জিলে পৌছাবো।

তার কথা মতো রিকশা ভাড়া করি। আহসান মঞ্জিলে প্রবেশের পর যেন অন্য এক মেমসাহেবকে আবিষ্কার করি। এতোটা উচ্ছলতা কখনো তার মধ্যে দেখিনি। তিনি দেখি ইতিহাসবিদ হয়ে গেছেন। শায়েস্তা খা থেকে শুরু করে নায়ক নাইমের পূর্ব পুরুষদের কাহিনী শুনাচ্ছেন আমাকে।

সম্ভবত দ্বিতীয় তলায় একটা সোফা বসানো আছে। আমি জানি সোফাতে সর্ব সাধারণের বসা নিষেধ। খুব সাহস করে তাকে বললাম, আমার সঙ্গে এই সোফাটায় একটু বসেন।

তিনি বসলেন।

তাকে বললাম, নিজেকে আমি এখন শায়েস্তা খার নাতি হিসেবে কল্পনা করছি।

তিনি বললেন, তাহলে আমি শায়েস্তা খার নাতবৌ।

আমার ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছিল জড়িয়ে ধরতে। মইনের কথা মনে পড়াতে দ্রুত সোফা থেকে উঠে যাই।

মঞ্জিল থেকে আমরা শপিংয়ে যাই। তিনি এটা-ওটা কেনেন।

আমি কিছু কিনে দিতে চাইলে নেন না।

শপিং শেষে যখন রিকশায় করে রুমে ফিরছিলাম, তখন তাকে বললাম, সব কিছু যদি ঠিক থাকে, আগামীকাল এই সময়ে আপনি মইনের হাত ধরে নিউ ইয়র্কের কোনো শপিং মলে হয়তো ঘুরবেন।

তার মুখে কথা নেই।

বড় বড় উপলক্ষ এলে মেমসাহেবকে কিছু গিফট করার চেষ্টা করি।

তাকে বললাম, জানি না, কখন আবার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়, খুব খুশি হবো আপনি যদি আমার কাছে কিছু একটা চান।

তিনি চুপ করে আছেন।

আবার বললাম, আমার সামর্থ সম্পর্কে তো আপনি জানেন। আমি দিতে পারি এমন কিছু একটা আপনাকে চাইতেই হবে। আপনাকে পাচ মিনিট সময় দিলাম। এই পাচ মিনিটের মধ্যে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। না হলে খোদার কসম করে বলছি, আপনাকে একা রেখে চলে যাবো।

রিকশা চলছে।

তার মুখে কোনো কথা নেই। আমার কোলে তার দুই বছর বয়সী বাচ্চা। ভাবছি তিনি কি চাইতে পারেন আর আমার পকেটে কতো টাকা আছে?

আমাদের রিকশা যখন রোকেয়া হলের সামনে তখনই তিনি বললেন, আমাকে একটা কিস করেন তো।

আমার জীবনে এমন অবাক হওয়ার মতো ঘটনা কখনো ঘটেনি। আমার পৃথিবী থমকে গেল। আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। কোনোদিন কখনো ওনার থেকে এ জাতীয় কিছু আশা করিনি। কারণ তিনি আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বৌ।

মেমসাহেবের দিকে তাকালাম।

দেখি তিনি চোখ বন্ধ করে আছেন।

সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না কি করবো।

অবশেষে আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তটি নিলাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোনো রকমে মেমসাহেবের ঠোটে একটা কিস করলাম এবং বিশ্বাসঘাতকদের খাতায় নিজের নাম ওঠালাম।

রুমে ঢুকেই মেমসাহেবের ওপর ঝাপিয়ে পড়লাম। তার সমস্ত শরীরে আদর করতে থাকি।

মেমসাহেব আমার আদরে পাগল হয়ে যান। তিনি যখন শারীরিক ভাষায় চূড়ান্ত সুখের জন্য আমাকে আহ্বান জানান তখন আমার মনে পড়ে সিজারিয়ান বেবির কথা। ডাক্তারের উপদেশ দেড় বছর পর তিনি মা হতে পারবেন।

জানি নরনারীর একবার মিলনেও বাচ্চা হয়।

আমি তাকে নিরাশ করি। আমি চাইনি তাকে আবার সার্জনের ছুরি, কাচির নিচে শোয়াতে।

অনেকক্ষণ তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকি।

মেমসাহেব ফিশ ফিশ করে বলেন, বিয়ে করলে আমাকে ভুলে যাবে না তো?

বললাম, আমার বাকি জীবনটা হয়তো আপনাকে ভোলার চেষ্টা করে কাটিয়ে দিতে হবে।

পরের দিন সকাল দশটায় তার ফ্লাইট।

ট্যাকসিক্যাবে করে যখন এয়ারপোর্টে যাচ্ছি তখন তাকে বললাম, দীর্ঘ দশ বছর পর আপনি যদি ফেরেন, আমিও হয়তো বিয়ে করে সংসারি হবো তখন কি এভাবে হাত ধরার অধিকার থাকবে?

তিনি আমাকে অবাক করে বললেন, আমি মরার আগেও আপনারই থাকবো।

ঠিক দশটায় ওনার ফ্লাইট নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়ে।

তিনি স্বামীর কাছে যাচ্ছেন।

আমি কার কাছে যাবো?

কক্সবাজার থেকে

তিন প্রজন্মে

– মোহাম্মদ মুইনুল ইসলাম

আমার তেত্রিশ বছরের জীবন ইতিহাসে প্রথম ঈদ এসেছিল ছাব্বিশ বছর বয়সে। আমাকে লেখা বাবার চিঠিটার ভাষা ছিল ঠিক এই রকম – *বাবা মুইন, আমার দোয়া নিও, অবশেষে এলো কাঙ্ক্ষিত সেই দিন। বহু প্রতীক্ষার পর তোমার নিয়োগপত্র গতকাল ডাক মারফত হাতে পেয়েছি।*

অর্থাৎ আমি একটি সরকারি চাকরি পেয়েছি।

অন্য লোক বা ডাক মারফত নয়, বাবা স্বয়ং আমার বড় ভাইকে পাঠিয়ে দিলেন নিয়োগপত্র পৌছে দিতে। বলে দিলেন যেন সরাসরি আমার হাতে দেয়।

নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে সত্যিই আত্মহারা হলাম। আট কেজি দই বন্ধু–বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনরা এক বসাতে শেষ করলো। ছোটবেলার সেই ঈদের আনন্দ নতুন করে অনুভব করলাম।

সাড়ে পাচ বছরের চাকরি জীবনে এই নিয়ে চারটি বিভাগে সাতবার বদলি হওয়ায় এখন ঈদপূর্ব রোজার কষ্ট অনুভব করছি।

আমার জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো ঈদের আনন্দ অনুভব করি একত্রিশ বছর বয়সে। প্রবাদ আছে ত্রিশে *তুঙ্গা,* একত্রিশে ভাটা। সেই ভাটার সময় বিয়ে করে আমার কাছে কেমন যেন ঈদ ঈদ মনে হচ্ছিল।

সবেমাত্র বাসা ভাড়া নিয়ে নতুন সংসার জীবন শুরু করলাম। পেটে ঘি সহ্য হলো না। মাত্র তিন মাসের মাথায় আমার বেরসিক কর্তৃপক্ষ আমাকে বদলি করে দিল তিন নাম্বার বিভাগে। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে। তখন বাস্তবে ছিল রোজার মাস। দুনিয়া ও আখেরাতের কষ্ট এক সঙ্গে অনুভব করি।

যোগদান করার এক সপ্তাহ পরই বাস্তবের ঈদ এলো। ঈদের আনন্দ আমার কাছে কেমন যেন তেতো মনে হচ্ছিল। কেননা বিক্ষিপ্ত মনে ঈদ আর চাদের আনন্দ উপভোগ করা যায় না।

ধরপাকড় করে মানবিক কারণে কিছুদিন পর আবার নিজের আস্তানায় চলে এলাম। রমজান মাস পার না হলেও আমার কাছে ঈদ মনে হচ্ছিল।

জীবনে তৃতীয়বারের মতো ঈদের খুশি অনুভব করি যখন আমার ছেলে রাহিক পৃথিবীতে আসে।

আমার গিন্নিটা বড্ড বেরসিক। ছেলেকে জন্ম দিতে গিয়ে খুশিতে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

শালাটা দৌড়ে গিয়ে আজান দিতে শুরু করে।

স্ত্রীর তখনো জ্ঞান ফেরেনি।

বাড়ির মহিলারা শালাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। বললো, আজান দিতে তাদের অনুমতি লাগবে। আজান দিতে আবার অনুমতি লাগবে কেন?

এমন কথা জীবনেও শুনিনি। যাহোক, স্ত্রীর জ্ঞান ফিরলো। ছেলে রাহিককে নিয়ে সবাই আতুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, শালা আজান দিতে লাগলো, কেউ বা মিষ্টি মিষ্টি বলে চিৎকার দিতে লাগলো। আমার কাছে মনে হচ্ছিল এই বুঝি প্রকৃত ঈদের আনন্দ।

বাচ্চার মাথা ন্যাড়া উৎসবে দাদা ও নানার বাড়ির প্রায় সবাই এলো। অনেক আনন্দ হলো। এক রিল ছবি তুলে ওয়াশ করে নিয়ে এলাম।

ছবি দেখে স্মৃতি আওড়াতে বেশ মজা লাগে। সেদিন রাতে গিন্নিকে মশারি টাঙাতে বলতেই সে গোখরা সাপের মতো ফোস ফোস করতে লাগলো আর ভারী গলায় বলতে লাগলো, হয়েছে, যাও, করে লাভ নেই, নাম নেই যখন তখন করে লাভ কি?

আমি আগা-মাথা কিছুই বুঝলাম না। একমাত্র শালীটা টেবিলে পানি রেখে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার, হেড কোয়ার্টার গরম কেন?

তখন তার কাছে জানালাম, বাচ্চার মাথা ন্যাড়া উৎসবের ওঠানো ছবিগুলোতে সবার ছবি থাকলেও পুরো এক রিল ছবির কোথাও ভুলক্রমে বাচ্চার মায়ের ছবি ওঠানো হয়নি।

যাহোক, শেষ পর্যন্ত শর্ত সাপেক্ষে মশারি টাঙানো হলো। শখের তোলা আশি টাকা। তাই পরদিন গিয়ে একটা নতুন ক্যামেরা এবং ফিল্ম কিনে নিয়ে আসি। সামনেই রোজা এরপর ঈদ। গেল ঈদের কথা বলছি।

গ্রামের বাড়িতে ঈদে একত্র হলাম দাদা, ছেলে ও নাতি এবং সেই সঙ্গে বৌমা ও শাশুড়ি। সবাই মিলে শেষ করলাম পুরো ফিল্ম।

আমার বাবা বহন করছেন অবিভক্ত ভারতবর্ষের স্মৃতি, আমি বহন করছি অবিভক্ত পাকিস্তানের স্মৃতি আর আমার ছেলে বহন করছে স্বাধীন বাংলাদেশের স্মৃতি।

ঈদের দিনে তিন প্রজন্ম একত্র হলে সবচেয়ে বেশি খুশি হন আমার বাবা। কেননা বড় কষ্টে অর্জিত এ মধুর মিলন ঈদের আনন্দকেও হার মানায়। এ যেন এক মহা ঈদ।

ফরিদগঞ্জ, চাদপুর থেকে

স্যানডাল

– শিবলী নোমানী রাজা

ছোট বেলাতে রমজান মাস শুরু হতেই ঈদের শপিংয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। বাসায় আসার আগে কেউ যেন শপিং করতে না পারে সেদিকেই লক্ষ্য রাখতাম সবচেয়ে বেশি। আমরা দুই ভাই-বোন মাত্র, আপ্পি অর্থাৎ, বড় বোনের আগেই অবশ্য আমার শপিং করা হতো সব সময়।

একবার এক রমজানের শুরুতেই আমার শপিং শেষ। আমার শপিংগুলো কাউকেই দেখতে দিতাম না, পুরনো হয়ে যাওয়ার ভয়ে। একবার কি মনে করে যেন নতুন স্যানডাল পায়ে দিয়ে যাচ্ছি জোহর-এর নামাজ পড়তে। আম্মা বার বার নিষেধ করছেন, রানা, নতুন স্যানডাল পরে যেও না, চুরি হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু আমি ঠিকই গিয়েছিলাম। নামাজ শেষে বাসায় ফিরবো। কিন্তু আমার স্যানডাল আর খুজে পাচ্ছি না কোথাও। বাসায় এলাম খালি পায়ে। আম্মাকে বললাম, তুমি কি আমার স্যানডাল মসজিদ থেকে নিয়ে এসেছো?

আম্মা উত্তর দিলেন তোমার স্যানডাল আমি নিয়ে আসবো কেন?

এরপরও আম্মার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। শেষে যখন সত্যিই বুঝলাম স্যানডালটি চুরি হয়ে গিয়েছে তখন আর কান্না থামাতে পারছিলাম না। আরো ভয় পেয়েছিলাম। কেননা আম্মা হুমকি দিয়েছিল, আমাকে এই ঈদে আর স্যানডাল কিনে দেওয়া হবে না।

শেষে ঠিক হলো আজ রাতেই আমার স্যানডাল কেনা হবে...কি আনন্দ!

সেদিনই সন্ধ্যায় ইফতার করে আমি আর আব্বা গিয়েছি নামাজ পড়তে, নামাজ পড়ে আমি আগেই এসেছি। কিছুক্ষণ পর শুনি, আম্মাকে আব্বা ডাকছেন, ফিরোজা, আমাকে একটা স্যানডাল দাও তো...।

বুঝতে পারলাম আব্বাও তার স্যানডালটি হারিয়েছেন। এই ঘটনায় আমি, আপ্পি এবং আম্মা তিনজনই খুব মজা করলাম আব্বার সঙ্গে।

এরপর ওই রাতেই আমরা আমাদের স্যানডাল আবারও কিনে আনলাম।

আজ আমাদের আম্মা বেচে নেই। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন ১৯৯১ সালে, যখন আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি। আম্মা বেচে থাকতে, আমি ঈদের চাদ দেখতে পেলেই দৌড়ে এসে আম্মাকে জড়িয়ে ধরে বলতাম, আম্মা, তুমি চাদ দেখেছো? চলো, ছাদে চলো, তোমাকে চাদ দেখাবো।

আম্মা আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলতেন, চলো, চাদ দেখতে যাই।

আমি তখন আম্মাকে চাদ দেখাতাম গভীর আগ্রহ নিয়ে। খুব বেশি মনে পড়ে আম্মা তোমাকে। জানি তুমি ভালো আছো। তারপরও ভালো থেকো তুমি, ভালোবাসি তোমাকে।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

প্রথম প্রেম

– মোহাম্মদ তোজাম্মেল হক

১৯৯৮ সাল। কুড়িগ্রাম জেলার ধরলা নদী আমাদের ভিটেমাটি বিলীন করে দিল। আমার বাবা সবেমাত্র দাদার সংসার থেকে আলাদা হয়েছেন। টাকা–পয়সাও তেমন হাতে নেই। কি করবেন কি করবেন ভাবতে ভাবতে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছেন।

মায়ের কিছু গহনাপাতি ছিল। শেষে সেগুলো বিক্রি করে ধরলা নদীর পশ্চিম পারে কুড়িগ্রাম শহরের কাছাকাছি একটা জায়গা কিনলেন বাড়ি করার জন্য। যে জায়গাটি বাড়ি করার জন্য কেনা হলো সেখানটায়ও কোনো না কোনো এক সময় চর কিংবা চর অঞ্চল ছিল।

আমরা বাড়ি করার পর প্রায় দুই বছর আশপাশে কোনো বাড়িঘর ছিল না। কিছুদিন পর অবশ্য অনেকেই জায়গা জমি কিনে বাড়ি করেছে। এখনো আব্বা প্রায় আমাদের বলেন, *মাদার বুড়ার বিশ একর জমি পঞ্চাশ হাজার টাকা তো দিছিলোরে! মুই ট্যাকার অভাবে কিনবার পারং নাই। সে জমি এখন দুই হাজার ট্যাকা শতাংশ বেচিবার লাগছে।*

আমাদের বাড়ির পশ্চিম পাশে যে গ্রামটি ছিল তার নাম ছিল ভেলাকোপা গ্রাম। সেই সূত্রে আমাদের গ্রামের নাম দেয়া হলো *চর ভেলাকোপা*। এখানে বাড়ি করার পর দেখেছি ভেলাকোপা গ্রামের শতকরা নব্বই ভাগ লোক অশিক্ষিত। বাকি দশ ভাগের মধ্যে প্রায় সাত ভাগই ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে। ওই গ্রামে দুই হাজারেরও বেশি মানুষের বাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটা ব্যাপার আমার জানা ছিল না।

একদিন সকালে আমার এক স্কুল মাস্টার হাটতে এসেছেন ভেলাকোপা গ্রামে। হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা। আমাকে বলা হলো, তুমি এতো সকালে এখানে কেন? তোমাদের বাড়ি না নদীর ওপারে?

আমাদের বাড়িঘর ধরলা নদীর ভাঙনে বিলীন হয়ে যাওয়ার ফলে আমরা এখানে বাড়ি করেছি।

তোমরা আর বাড়ি করার জায়গা পেলে না?

ক্যান?

আমি এই গ্রামের পাশের গ্রামে আজ বিশ বছর ধরে আছি। তাতে যতোটুকু জানি এই গ্রামে একজন ইন্টারমিডিয়েট পাস ছেলে নেই। আসল কথা হলো, এই গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ গাজা, ফেনসিডিলসহ বিভিন্ন প্রকার নেশা জাতীয় পণ্যদ্রব্যের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত।

এগুলো কোথায় পায়?

কেন, ইনডিয়া থেকে নিয়ে আসে।

আমার আব্বা ছিলেন একজন জাত কৃষক। জমিজমা তো সব ধরলা নদীর গর্ভে চলে গেল, এখন কি হবে এই জাত কৃষকের?

আমিও এসএসসি পাস করে সবেমাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছি। ছোটভাই দুজন। একজন ক্লাস এইটে, অন্যজন ক্লাস সেভেনে পড়ে। তাদেরই বা কি হবে!

যাহোক, পড়ালেখা না হয় বাদই দিলাম। সংসার চলবে কিভাবে? খাবো কি? পড়বো কি? কথায় আছে না *বাচায় আল্লাহ মারে কে?* আমাদের চারটা গরু ছিল। দুটা বলদ এবং দুটো গাভি। বলদ দুটা দিয়ে আব্বা জমি চাষ করতেন।

একদিন ওই গ্রামের জোনাকু নামের এক লোক এসে আব্বাকে বললেন, আপনার তো দুটো হালের গরু আছে, তাই না?

হ্যা আছে।

তাহলে তো আপনি হাল বিক্রি করতে পারেন।

এখানে হাল কিনেব ক্যাডা?

কেন আমি কিনবো। আমাদের এখানে অনেকে হালই পায় না।

তা কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত হাল বোয়াতে হবি?

এই ধরুন সকাল আটটা থেকে দুপুর একটা।

সেদিন থেকে হাল বিক্রি করা শুরু করলেন আব্বা।

এদিকে তিন মাসের মধ্যে গাভী দুটোরও বাছুর হলো। দুটা গাভী থেকে তিন কেজি করে দুধ পাচ্ছি। প্রতিদিনকার দুধ আমিই বিক্রি করে থাকি।

এভাবে হাল বিক্রির টাকা দিয়ে সংসার ভালোই চলছে আর আমাদের পড়ালেখার খরচ সে তো গাভীর দুধ।

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘণ্টা খানেক পড়ালেখা করার পর জগে করে দুধ নিয়ে যেতে হতো কুড়িগ্রাম শহরের বাসায় বাসায়। সকাল দশটার মধ্যেই আমাকে ফিরতে হতো। কেননা দশটার পরে আবার কলেজ যাওয়ার পালা।

এমনিভাবে এক গ্রাম্য ছেলের জীবন যাত্রা।

এভাবে বছর খানেক যেতে না যেতেই আব্বা কিছু জমি বর্গা নিলো। জমিগুলো ছিল নার্গিসের আব্বার।

একদিন ষোল শতাংশ একটা বর্গা জমিতে আমরা তিন ভাই এবং দুজন কামলাসহ ধানের চারা রোপণ করছি। মাথা নিচু করে ধানের চারা রোপণ করতে হয়। সে কারণে মাজা লেগে যায়। কিছুক্ষণ পর পর মাজা সোজা করে দাড়াতে হয়। একবার সোজা হয়ে দাড়াতেই দেখি চপলা-চঞ্চলা সুন্দরী এক মেয়ে জমির আল দিয়ে হাটছে।

চিৎকার করে বললাম, এই মেয়ে তুমি জমির নরম আল দিয়ে হাটছো কেন? আল ভেঙে যাবে তো।

আমাদের জমির আল দিয়ে আমি হাটবো না তো হাটবে কে? এই বলে এক দৌড়ে চলে গেল।

একটু পরে আবার এলো।

এবার করুণ সুরে বললাম, এই মেয়ে, তোমার নাম কি?

কেন, নার্গিস।

তোমার আব্বার নাম?

এনামুল।

পড়ালেখা করো না?

করি।

কোন ক্লাসে পড়ো?

ক্লাস নাইনে।

এদিকে সূর্যও ডুবু ডুবু, আমাদের চারা রোপণও শেষ। যে যার মতো কাদাজলে হাত পা ধুয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

পরদিন সকালে দুধ নিয়ে যাওয়ার সময় নার্গিসদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছি। আবারও নার্গিসের দেখা। আমাকে দেখে কেমন যেন একটু বাকা হাসি হাসলো।

আমি লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম। আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। দুধ বিক্রি শেষে বাড়িতে এসে কবিতার মতো করে একটি প্রেমপত্র লিখলাম –

শোন হে অচেনা মেয়ে!

কেন যে হাসো তুমি আমার দিকে চেয়ে?

জানি না তোমার মনের বাসনা

পত্র পেয়ে আর যেন হেসো না?

দেখলে তোমার হাসি

পড়তে ইচ্ছা করে মোর গলে ফাসি

ভালোবাসতে চাই আমি তোমাকে

উত্তর দিও তুমি আমাকে।

এটুকু লিখে কাগজখানা হাতে নিয়ে আব্বাকে বললাম, আব্বা, আমি একটু ধান ক্ষেত দেখে আসি?

আচ্ছা যাও।

খুশি হয়ে হাটতে শুরু করলাম নার্গিসদের বাড়ির দিকে। নার্গিসদের বাড়ির আশপাশে ঘোরাফেরা করছি, দেখা তো পাচ্ছি না।

কিছুক্ষণ পর নার্গিসের বান্ধবী ফাতের সঙ্গে দেখা হলো।

ফাতেকে বললাম, তুমি কি নার্গিসকে চেনো?

হ্যা, চিনবো না কেন? ওতো আমার বান্ধবী।

আচ্ছা, নার্গিসকে একটা খবর দিতে পারবা?

হ্যা, খুব পারুম।

দাড়িয়ে আছি শ্যালো মেশিনের ঘরের পাশে। পাচ মিনিটের মতো দাড়িয়ে থাকার পর নার্গিস এলো।

আমাকে ডেকেছেন?

হ্যা।

কেন?

আমি তোমাকে একটা জিনিস দেবো, নেবে?

যদি নেয়ার মতো কোনো কিছু হয় তাহলে নেবো।

তোমার হাতটা দেখি।

নার্গিস হাতটা বাড়িয়ে দিল।

আমি চিরকুটটুকু তার হাতে দিলাম।

চিরকুটটুকু হাতে নেয়ামাত্রই তার চাচা এসে ওখানে হাজির। কিন্তু ভাগ্যিস চিরকুটটি দেখেননি।

নার্গিস এখানে কি করছো?

আমার ছাগলটা যে কোথায় গেল? তা খুজছি।

ছাগল হারিয়েছে বুঝি?

হ।

নার্গিসের চাচা চলে গেলেন, সঙ্গে নার্গিসও গেল।

পরদিন আবার দুধের জগ হাতে নিয়ে শহরের দিকে হাটছি। দূর থেকে দেখতে পেলাম নার্গিস আমার দিকে আসছে। সামনাসামনি হওয়ার পর বললাম, কি ব্যাপার, এখানে কি?

আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

কেন?

গতকাল যে জিনিসটা দিয়েছেন তা ফেরত দিতে।

কেন, ওটা পড়োনি?

পড়েছি।

দাও।

চট্টগ্রাম থেকে

মিস কলার

– শফিকুল ইসলাম

গ্রামীণফোনের একটি নাম্বার থেকে আমার মোবাইলে প্রায়ই মিসকল আসে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। মিসকল দাতা বোধহয় নাছোড়বান্দা টাইপের। নইলে অন্যরা যেখানে দুই চার দিন মিসকল দিয়ে ক্লান্ত হয়ে যায় সেখানে এই মিসকল দেনেওয়ালা বিরতিহীনভাবে মিসকল দিচ্ছে এবং দিয়ে যাচ্ছে। তার ধৈর্যের প্রশংসা করতে হয়! বিরক্তি লাগলেও কখনো ব্যাক করিনি। কেননা ব্যাক করাটা বেহুদা। অনেকেই দুষ্টুমি করে মিসকল দেয়।

একদিন দুপুরে বন্ধু রুবেলের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি। এ সময় বেরসিকের মতো ওই নাম্বার থেকে মিসকল!

আড্ডায় ছন্দপতন ঘটায় মেজাজ খিচড়ে গেল। সিদ্ধান্ত নিলাম ব্যাক করে কড়া কিছু কথা শুনিয়ে দেবো।

বিধি বাম। কড়া কথা শোনানো হলো না।

ওপাশ থেকে ফোন রিসিভ করে একটি নারী কণ্ঠ বলে উঠলো, আমি নিবেদিতা সেন, আপনার ফ্যান।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে বললাম, ফ্যান মানে? আমার ফ্যান আসবে কোত্থেকে। আমি তো নায়ক, গায়ক বা খেলোয়াড় গোছের কেউ না।

এরপর সে আমার লেখা কোথায় কোন কোন পত্রিকায় পড়েছে তার ফিরিস্তি দিল। ফোন নাম্বার সংগ্রহ করেছে প্রচার সংখ্যায় সর্বশীর্ষের দাবিদার তিনটি জাতীয় দৈনিকের একটির ফিচার পাতা থেকে।

মাঝে মধ্যে একটু–আধটু লেখালেখির চেষ্টা করি বটে কিন্তু আগডুমবাগডুম কি লিখি নিজেই বুঝতে পারি না। অত্যুৎসাহী কোনো পাঠক যখন চিঠি লিখে বা ফোন করে তখন লজ্জায় পড়ে যাই।

নিবেদিতার সঙ্গে চার মিনিট কথা বলার শেষে মিসকল দিতে মানা করলাম।

সে সানন্দে তা মেনে নিল।

ফোন রাখার পর পরই একটা মেসেজ এলো Glad to meet you so much. Friendship?

আমাদের বন্ধুত্ব জমে উঠলো।

বছরের বিশেষ দিনে সে সুন্দর এসএমএস পাঠায়। কখনো কখনো গভীর রাতে ফোন করে।

আমি কখনো ফোন করিনি। যেহেতু মোবাইলটা ওর বাবার। ও-ই সময় সুযোগ বুঝে ফোন করে। তবে মেসেজ পাঠাতাম। ওর বাবা বোধহয় মোবাইলের সব ফাংশন বোঝেন না। নির্বিঘ্নে চলে আমাদের মেসেজ চালাচালি। এরই ধারাবাহিকতায় নিবেদিতা আমাকে একটা মেসেজ পাঠালো। খুব রোমান্টিক কয়েকটি পংক্তি –

When sky becomes dark, I remember you, When clouds gather, I remember you,
When rain starts, I remember you,
When I get wet, I remember you.
Can you tell where is my umbrella?

যখন আকাশ অন্ধকার হয়, তখন তোমাকে মনে পড়ে।
যখন মেঘ জমে, তখন তোমাকে মনে পড়ে।
যখন বৃষ্টি হয়, তখন তোমাকে মনে পড়ে।
যখন আমি ভিজে যাই, তখন তোমাকে মনে পড়ে।
তুমি কি বলতে পারো আমার ছাতাটা কোথায়?

এ রকম আরো অসংখ্য মেসেজ। আমাদের সম্পর্ক একটা পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে দ্রুত গতিতে।

কোনো এক শুক্রবারে সে একটা মেসেজ পাঠালো – I miss you and I love you. Please call me. # Nibedita sen. মেসেজটা পাঠিয়েছে একটা একটেল নাম্বার থেকে।

কল করলাম। কথা হলো, আমাদের সামনাসামনি দেখা হওয়া উচিত। সে জন্য নিবেদিতা আগামীকাল সকাল এগারোটায় *ফ'য়স লেক*-এর গেটের ডানদিকে লেক ভিউতে অপেক্ষা করবে। পরনে থাকবে গোলাপি থ্রি পিস। সঙ্গে একটেল ফোনটাও থাকবে।

উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা, ভয়, শিহরণের সুদীর্ঘ সময় পার করে নির্ধারিত সময়ের আগেই *ফ'য়স লেক* গেলাম।

কতো যুগ, কতো শতাব্দী পর এগারোটা বাজলো। লেক ভিউতে অনুসন্ধানী চোখ অদেখা মানবীকে খুজে পেল না। এগারোটা পাচ মিনিটে স্বপ্ন মানবীর নাম্বারে ফোন করলাম। রিং বেজে চললো, কেউ রিসিভ করলো না। কি ব্যাপার, এমন তো হওয়ার কথা না!

এগারোটা দশ মিনিটে আবার ফোন করলাম। তিনবার রিং বাজার পর ওপাশ থেকে লাইন কেটে দিল।

এগারোটা পনেরো মিনিটে ফোন করে সেই অতি পরিচিত কণ্ঠ শুনলাম। দুঃখিত, আপনার ডায়ালকৃত নাম্বারটি এই মুহূর্তে বন্ধ আছে ...।

কিছুতেই মেলাতে পারলাম না আমার সঙ্গে নিবেদিতা এমন আচরণ করলো কেন! ভাবতে ভাবতে আবিষ্কার করলাম, গতকাল ছিল পয়লা এপৃল তথা এপৃল ফুল। তার মানে নিবেদিতা আমাকে Fool বানিয়েছে! বোকামির জন্য নিজের প্রতি রাগ হলো। আমাকে মদন বানিয়ে ওই মেয়ে হয়তো এতোক্ষণে বান্ধবীকুলের সঙ্গে অট্টহাসির আসর বসিয়েছে।

তবু কেন জানি মনের অন্যদিক বলছে, নিবেদিতা আমার সঙ্গে এমন ফাজলামি করতে পারে না।

অনতিদূরে আমাদের কলেজ। হাটতে হাটতে কলেজে চলে এলাম। অর্থনীতির ক্লাস চলছে। বই-খাতা ছাড়াই ক্লাসে ঢুকে পড়লাম সুবোধ বালকের মতো। এরপর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্লাস ছিল। খায়ের স্যার আজ আসেননি। তাই ক্লাস হচ্ছে না। বসে বসে সহপাঠী সিরাজ ও আয়শার সঙ্গে গল্প করছি। এ সময় নিবেদিতার মিসকল।

ব্যাক করলাম। নিবেদিতা বললো, কি ব্যাপার, আপনি আসেননি কেন? আমি তো USTC-র উপরে ছিলাম।

বললাম, আমি তো চল্লিশ মিনিটের মতো অপেক্ষা করেছি। আপনিই বরং আসেননি। ঠিক আছে, লেক ভিউতে অপেক্ষা করুন। আমি পাচ মিনিটের মধ্যে আসছি।

পুনরায় ফ'য়স লেক এলাম। লেক ভিউ খা খা করছে। USTC-র দিকে তাকালাম। এক দল মেয়ে বসে-দাড়িয়ে গল্পগুজব করছে। এদের মধ্যে নিবেদিতা কে? তাছাড়া ও কি আসলেই এসেছে? এলেও ইচ্ছাকৃতভাবে ভিড়ের মাঝে মিশে আছে? নায়ক পছন্দ হলে ধরা দেবে, না হলে চম্পট!

USTC-তে এক চক্কর দিলাম। এমন কাউকে পেলাম না যার চোখ আমাকে তীক্ষ্নভাবে ফলো করছে। ফোন করতে গিয়ে দেখলাম ওর মোবাইল বন্ধ! তার মানে আমাকে রামবোকা বানানো হয়েছে। নিজেকে *ছাগল, ভেড়া, বলদ, গাধা* বলে গালি দিতে দিতে বাসায় ফিরলাম। আমার নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরালো। ছিঃ ছিঃ লজ্জা। বড় লজ্জা।

দ্বিতীয়বার ওখানে যাওয়া আমার মোটেও উচিত হয়নি। লেক ভিউতে অপেক্ষা করার কথা বলে USTC-তে কেন গেল জানতে চাওয়া উচিত ছিল। শালার মাথা কেন যে সময় মতো কাজ করে না। এমন ফাজলামির মানে কি জানতে চেয়ে ওর গ্রামীণফোনে মেসেজ পাঠালাম।

রাতে দুইটা মিসকল এলো। তৃতীয়বারে বেল তলায় গেলাম না।

পরদিন সকালবেলা সরাসরি ফোন এলো। নাম্বার চিনতে পেরেও ঝাজালো কণ্ঠে বললাম, কে? কাকে চান?

উত্তর এলো পুরুষ কণ্ঠে, আমি নিবেদিতার বাবা! গতকাল আপনার নাম্বার থেকে একটা মেসেজ পেয়েছি। নিবেদিতা কি ফ'য়স লেক গিয়েছিল?

হায়! কি থেকে কি হয়ে গেল। অস্বীকার করার উপায় নেই। সব কিছু সত্য সত্য বলা শেষে নিবেদিতাকে বাচানোর জন্য বললাম, গতকাল এপৃল ডে ছিল। অন্যকে বোকা বানানোর দিন। সিরিয়াস কিছু না।

নিবেদিতার বাবা হ্যা না কিছু না বলে ফোন রেখে দিলেন।

তারপর বেচারীর ভাগ্যে কি ঘটেছে জানি না। তবে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছেন।

এরপরও বেশ কয়বার নিবেদিতার মিসকল, কল, মেসেজ এসেছে। ফোন রিসিভ করিনি, মেসেজ ডিলিট করে দিয়েছি। অনেক হয়েছে, ওর ফাদে আর পা ফেলতে চাই না।

বন্ধু হৃদয় অনেক দিন বলেছে নিবেদিতার নাম্বার দিতে। কোনো ওয়েব সাইটে ছেড়ে দেবে। তাহলে ফাজলামির মজা বুঝবে।

দেইনি। কথায় আছে, *তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?*

চট্টগ্রাম থেকে

www.geocities.com/shafique_prokash

দুবাই থেকে রোম

– শফিউল আলম তরফদার

সভ্যতার পিঠস্থান রোম-এ যাত্রার উদ্দেশ্যে সকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই জিয়া আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে উপস্থিত হই। খুব সহজেই ইমিগ্রেশন পার হয়ে দশটা থেকেই উড়োজাহাজে পা রাখার জন্য অপেক্ষা করে আছি। প্রথম গন্তব্য স্থান ছিল দুবাই। কারণ আমার এয়ারলাইন্স ছিল এমিরেটস-এর।

দুবাই যামু টাকা আনুম আমজাদ হোসেনের নাটকের সেই দুবাই যাওয়ার আগ্রহে এমিরেটস বেছে নিয়েছিলাম। দশটার ফ্লাইট শেষ পর্যন্ত পৌনে এগারোটায় যাত্রা শুরু করলো।

চমৎকার আধুনিক সিসটেমে সজ্জিত ছিল প্লেনের সব ক্লাস। ইকনমি ক্লাসেও প্রত্যেক চেয়ারের সঙ্গে ছিল অডিও এবং ভিডিও সিসটেম। উন্নত মানের খাবার পরিবেশনের পাশাপাশি এয়ারহস্টেসের ব্যবহারও ছিল চমৎকার।

বাজিগর হিন্দি ফিল্মটি দেখতে দেখতেই পৌছে গেলাম দুবাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে।

চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ট্রানজিট ভিসা নিয়ে হোটেলে যাওয়ার জন্য গাড়ির অপেক্ষায় আছি। হোটেলের নাম লেখা আছে *সেলিম*।

এক ঘণ্টা দাড়িয়ে থাকার পরও সেলিম হোটেলের কোনো গাড়ি না পাওয়াতে এয়ারপোর্টের ইনফরমেশন সেন্টারে খোজ নিলাম।

তারা জানালো, সেলিম নামের কোনো হোটেল নেই দুবাই শহরে। আছে *শেল ইন*। তারা আমাকে পরামর্শ দিল, আপনি শেল ইন-এ চলে যান।

ধ্বনিগত ভাবে সেলিম ও শেল ইন কাছাকাছি। তাই বোধহয় এই পরামর্শ।

দুই ঘণ্টা পর এয়ারপোর্টের বাইরে দেখি আমি ছাড়া একটি সিলেটি পরিবার দাড়িয়ে আছে যারা কিছুই বোঝে না।

সিলেটি পরিবারকে জিজ্ঞাসা করলাম, *কিতা খবর?*

তারা আঞ্চলিক ভাষায় বোঝালো, তাদের শেল ইন হোটেল যেতে বলেছে। কিন্তু কেউ তাদের ডাকে না।

তখন তাদের হোটেল শেল ইন-এর গাড়ি দেখিয়ে দিলাম এবং নিজেও সেখানে উঠে বসলাম। অত্যাধুনিক টয়োটা সুপার রুফ মাইক্রোবাসে আরাম করে যখন ট্রানজিট ভিসা দেখছি তখন আমার অবস্থা আক্কেলগুড়ুম, উপরে হোটেলের নাম ভুল লিখলেও নিচে ঠিকই ছোট করে লেখা ছিল হোটেল শেল ইন।

হোটেলে যখন পা রাখলাম ততোক্ষণে আমার তিন ঘণ্টা নষ্ট হয়ে গেছে।

বিকেলের হালকা নাশতা খাওয়ার জন্য বিশাল লিফটে পা রাখলাম। আগেই রিসেপশন থেকে জেনে নিয়েছিলাম আন্ডারগ্রাউন্ডে রেস্টুরেন্ট। স্বাভাবিকভাবে লিফটে আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরের সুইট টিপে দিলাম। কিন্তু লিফট চলার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। হঠাৎ লিফটের দরজা খুলে যাওয়াতে দেখি রেস্টুরেন্টে পৌছে গেছি। লিফটের এতো মসৃণ চলন যে বোঝার উপায় নেই লিফট চলছে।

রেস্টুরেন্টে অধিকাংশ ইনডিয়ান তরুণ-তরুণী যারা সুন্দর ইংলিশ বলে। ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ভালো টিপস দিলাম। পরে বুঝলাম ভালো টিপস পাওয়ার জন্যই তারা এতোক্ষণ সুন্দর করে কথা বলেছিল।

দশ দিরহাম অর্থাৎ বাংলাদেশের একশ বিশ টাকা খরচ করে ট্যাকসিতে বাজারে গেলাম। ট্যাকসিচালক একজন পাকিস্তানি। সেখানকার অধিকাংশ চালকই পাকিস্তানি ও ইনডিয়ান।

ফুটপাথ দিয়ে হেটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি একজন পরিচিত লোক চিৎকার করে আমার নাম ধরে ডাকছে। দুবাই শহরে আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। আমাকে সে বিভিন্ন মার্কেটে নিয়ে গেল।

এমন একটা মার্কেটে গেলাম যেখানে গেলে মনে হবে না আপনি বিদেশে আছেন। সব চিটাগাংয়ের মানুষ, চিটাগাংয়ের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছে, গল্প করছে, দোকানগুলোও চিটাগাংয়ের মানুষের।

কিছু সওদা করে ইলেকট্রনিক্সের জিনিস কেনার জন্য অন্য একটা মার্কেটের দিকে যখন যাচ্ছি তখন ফুটপাথের পাশে দুই বাংলাদেশিকে আট দশটা আম নিয়ে দাড়িয়ে থাকতে দেখলাম। মনে দুঃখ লাগলো। এই সমস্ত দুঃখী মানুষেরা যখন দুবাই থেকে দেশে ফিরে যায় তখন এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে চাদাবাজরা তাদের কিভাবে উৎপাত করে।

একটা দেশে কতটুকু উন্নতি করেছে সেটা আচ করা যায় ওই দেশের ট্রাফিক সিসটেম দেখলে। সমস্ত কিছুই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। পথেঘাটে পুলিশ দেখা যায় না ঠিকই কিন্তু কোনো ধরনের ব্যতিক্রম হলেই মুহূর্তের মধ্যেই হাজির হয়ে যায় পুলিশ। গাড়ি নির্দিষ্ট গতিসীমার উর্ধে চললেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধরা পড়ে যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক ট্রাফিক সিসটেম চালু রয়েছে এখানে। এখানকার বিল্ডিংগুলো প্রায়ই বহুতল বিশিষ্ট। অতি আধুনিক স্থাপত্যের সব নিদর্শন কাচ দিয়ে এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, দাড়ালে নিজের ছায়া পর্যন্ত দেখা যায়। একটু পুরনো হলেই ভেঙে আধুনিকতার ছোয়া লাগানো হচ্ছে।

বিভিন্ন মার্কেট এবং দর্শনীয় স্থান দেখে রাতে হোটেলে ফিরে এলাম। ভোরে এয়ারপোর্টে ছুটতে হবে। গন্তব্যস্থল রোম। আমাদের দেশের দুঃখী মানুষের টাকা কামানোর স্বপ্নের শহর দুবাই ছেড়ে প্লেন পাড়ি জমালো।

দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা আকাশ পাড়ি দিয়ে রোম–এর *লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট*–এ নেমে আল–ইটালিয়া ধরার জন্য ডমেস্টিক এয়ারপোর্টে পৌছালাম। প্রথমে একশ ডলার ভাংতি করে ইটালির লিরা এক লাখ পঞ্চাশ হাজার নিলাম। মনে হলো হাতে অনেক টাকা। একটা ভালো সিডি ওয়াকম্যান কিনবো, সে আশায় ইলেকট্রনিক্সের দোকানে ঢুকলাম। একক দশক গুণে যখন লিরার হিসাব করছি তখন একবার মনে হয় সম্ভবত পয়তাল্লিশ হাজার, আবার মনে হয় চার লাখ পঞ্চাশ হাজার লিরা। একটা সতর্কতার সঙ্গে যখন গুনলাম তখন দেখি ওটার দাম চার লাখ পঞ্চাশ হাজার লিরা। একশ ডলার ভাংতি করে যে লাখপতি হলাম সেটার মাজেজা প্রথম বুঝলাম।

তারপর গেলাম নাশতার দোকানে। এক কাপ কফির দাম যখন দেখলাম দুইশ পঞ্চাশ টাকা তখন এক কাপ কফি খেতে দ্বিধা লাগলো। পরে বুঝেছি প্রথম প্রথম এ রকমই লাগে। পরের দিন থেকে অবশ্যই এটা কেটে যায়। কারণ পরের দিনই বিশ লাখ ষাট হাজার লিরার একটা চেক পেয়েছিলাম।

আল ইটালিয়াতে উঠে রোম থেকে বিজ্ঞানের শহর ট্রিয়েস্ট–এ উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এক ঘণ্টার মধ্যে ট্রিয়েস্টে পৌছে গেলাম।

বাসে করে দশ হাজার লিরায় প্রফেসর সালামের রিসার্চ সেন্টারে যাওয়া যায়। কি মনে করে হঠাৎ ট্যাকসি ডাক দিলাম।

বিশাল আকৃতির মার্সিডিস টাইপের একটা গাড়ি এসে থামলো।

সঙ্গী বললো, মিটার লাগানো আছে সুতরাং কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যখন দেখি রাস্তা শেষ হয় না আর মিটারে ক্রমেই বিশ হাজার, বাইশ হাজার, পচিশ হাজার লিরা করে উঠে চলেছে, তখন স্বাভাবিকভাবে ঘাবড়ে যাওয়ার কথা। অনেকক্ষণ পরে গেস্ট হাউসের সামনে এসে পৌছালাম। মনে হলো যেন এক যুগ লেগেছে।

ড্রাইভার অত্যন্ত বিনীতভাবে পচাত্তর হাজার লিরার একটি স্লিপ ধরিয়ে দিল।

অগত্য কি আর করা! পচাত্তর হাজার লিরা দিয়ে বিমর্ষ মনে গেস্ট হাউসের দিকে পা বাড়ালাম।

গেস্ট হাউসের রিসেপশনে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে রুমে গেলাম।

রুমে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন ইনডিয়ার মধ্য প্রদেশের ইউনিভার্সিটির একজন শিক্ষক। পরিচয় পর্বে প্রথম জানালেন এই রুমে তোমাদের দেশের একজন শিক্ষক ছিলেন। মুচকি হেসে বললেন, তিনি সাত জোড়া জুতা কিনেছিলেন।

প্রথমে আক্রমণাত্মক কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু তার কথার সত্যতা অস্বীকার করতে পারি না। তোমাদের দেশের মানুষ বোঝে না কেন, এই জুতার চামড়াগুলো আমাদের সাবকন্টিনেন্ট থেকেই আসে। এখানে ফিনিশিং করার পর হয়ে যায় *মেড ইন ইটালি*।

তার দেশপ্রেম, অকাট্য যুক্তি আমাকে মুগ্ধ করে। দীর্ঘ এক মাস তার সঙ্গে একই রুমে ছিলাম। প্রতিদিন সকালে আমাকে বেড–টি খাওয়াতেন এবং ইওরোপের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ছোট একটা লেকচার দিতেন। আমাকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন।

ট্রিয়েস্টের সে অল্প সময়ে বহু দেশের মানুষের সঙ্গে সে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতিসহ বহু মজাদার আলাপ–আলোচনার সুযোগ হয়েছে। এগুলো থেকে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে এই ছোট্ট পরিসরে সেবার লেখার অবকাশ নেই। তাই অনেকেরই অজানা একটি তথ্য দিয়ে আমার লেখার ইতি টানছি।

রাশিয়ার এক বিজ্ঞানী ছিলেন আমার রুমে যার নাম ছিল আলেকজেন্ডার। তিনি এক বিখ্যাত রিসার্চ সেন্টারের ফেলো ছিলেন। প্রথম মহাশূন্যচারী *ইউরি গ্যাগরিন*-এর নাম আমরা সবাই জানি। ওনার বীরত্বের কথা, দুঃসাহসিকতার কথা আমরা বইপুস্তকে পড়েছি। কিন্তু মেজর গ্যাগরিনের যে তথ্য আলেকজেন্ডার দিলেন সেটা সত্যিই দুঃখজনক। গ্যাগরিন আসলে একজন দক্ষ পাইলট ছিলেন। ওনার বিমান যখন ক্র্যাশ করে, তখন ঠিকভাবেই প্যারাশুটের মাধ্যমে তিনি ভূখণ্ডে নেমে আসেন।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে মাথায় তীব্র আঘাত লাগার ফলে মস্তিষ্কে গণ্ডগোল হয়ে যায়। রাশিয়ায় তখন চরম কমিউনিস্ট এবং কট্টরপন্থীদের শাসন চলছিল। গ্যাগরিন যেহেতু জাতীয় বীর ছিলেন এবং পৃথিবীর প্রথম মহাশূন্যচারী ছিলেন সেহেতু মৃত্যু পর্যন্ত রাশিয়া এই মহামানবকে পাগল (!) হওয়ার অপরাধে জেলে অন্তরীণ করে রেখেছিল।

তাদের যুক্তি ছিল পৃথিবীর এই মহামানব যদি পাগল রূপে পরিচিত হয় তাতে রাশিয়ার সম্মানের ওপর কলংকের ছাপ পড়তে পারে।

আলেকজেন্ডারের এই তথ্যটুকু সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের সুযোগ নেই। কিন্তু বিশ্ববাসী জানে, মেজর গ্যাগরিন এক প্লেন ক্র্যাশ-এ নিহত হয়েছেন।

দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম থেকে

tarafdersa@gmail.com

সেই দিনগুলো

- মাফুজা খানম জলি

আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আমার আব্বা ছিলেন সরকারি চাকুরে। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। আমরা সাত ভাইবোন। চার ভাই, তিন বোন। আমি আব্বা মায়ের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান।

আমাদের আব্বা তার সীমিত আয়ের ভেতর দিয়ে সৎ পথে থেকে তার সাতটি সন্তানকে মোটামুটিভাবে মানুষ করেছেন। প্রাচুর্য আমাদের ছিল না এটা ঠিক। তবে অসচ্ছলতাও ছিল না। তাই আমাদের আব্বা অন্তত রোজার ঈদে সবাইকে কাপড়-চোপড় দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতে পারতেন। তখন আব্বার দেয়া ঈদের কাপড় পেয়ে মনে হতো যেন ঈদের চাদটাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি।

নিজেদের ঈদের কাপড় লুকিয়ে রেখে প্রতিবেশীদের বাচ্চাদের ঈদের নতুন কাপড় সুকৌশলে দেখে নিতাম। অবশ্য যারা চালাক ছিল তারা দেখাতো না। অনেক সময় তাদের অগোচরে তাদের মায়েদের কাছ থেকে ঈদের আগে তাদের কাপড় দেখে নিতাম। এ নিয়ে অবশ্য অনেক কান্নাকাটিও হতো। পরে খুবই খারাপ লাগতো। কৃতকর্মের জন্য নিজেকে অপরাধী মনে হতো।

তখন ধারণা ছিল, ঈদের কাপড় ঈদের দিনের আগে দেখে ফেললে তা পুরনো হয়ে যায়। ঈদের দিন খুব ভোরে উঠে সাবান মেখে পুকুরে ডুবিয়ে গোসল করে চুপি চুপি নতুন কাপড় পরতাম। কেননা পরার আগে দেখলেও তা পুরনো বলে গণ্য হবে। তারপর কাপড়ে ও হাতের উল্টো পিঠে আতর মেখে আব্বা মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রতিবেশীদের বাড়ি গিয়ে সহপাঠী, বান্ধবীদের সঙ্গে ঈদের মাঠে যেতাম। কখনো বা আব্বা অথবা বড় ভাইবোনদের সঙ্গে ঈদের মাঠে গিয়েছি।

এখন চাকরি করি। আমরা সবাই মোটামুটি চাকরি ও ব্যবসা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। নিজের চাকরির বেতন বোনাসের টাকা দিয়ে নিজে কাপড় কিনলেও ছোট বেলায় আব্বার দেয়া সেই ঈদের কাপড়ের মতো আনন্দ আর পাই না।

মাঝে মধ্যে আব্বা-মা ও বড় ভাইবোনেরা ঈদে কাপড় এবং অন্য কোনো উপহার দিলে তাতে সেই ছোটবেলার মতোই আনন্দ পাই।

এখন ঈদে নিজে কিছু কেনার চেয়ে অন্যকে উপহার দেয়াতে অনেক বেশি আনন্দ ও তৃপ্তি পাই।

আমাদের সাবলম্বী হওয়ার পেছনে আব্বা-মায়ের অবদান অবিস্মরণীয়। তাদের জন্য প্রাণ খুলে আল্লাহতায়ালার দরবারে দোয়া করি।

অতীতের দিনগুলোর কথা যখন মনের পর্দায় ভেসে ওঠে তখন খুবই রোমাঞ্চিত হই। কতোই না আনন্দের ছিল অতীতের ফেলে আসা সেই দিনগুলো।

ফকিরহাট, বাগেরহাট থেকে

বর্ণহীন জীবন

– রেজাউল করিম

১৯৯২ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিলাম। লক্ষ্য ছিল বোর্ডে প্রথম স্থান দখল করা। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা আমার সে লক্ষ্য বাস্তবায়িত হতে দিল না। অবশেষে সম্মিলিতভাবে ষোলতম স্থান নিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। কিন্তু নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসটা ছিল বেশি রকমের। ভাবলাম কমার্স আর পড়বো না। তাই এবার লক্ষ্য নিলাম ইংরেজিতে পড়াশোনা করার। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ‘গ’ ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা না দিয়ে গ্রুপ চেঞ্জের জন্য কেবল ‘ঘ’ ইউনিটে পরীক্ষা দিলাম এবং বেশ ভালো অবস্থান নিয়ে পাস করলাম।

এবার ইন্টারভিউ। সোজা কথায় সাবজেক্ট চয়েস করা আর কি! ইন্টারভিউর চেয়ারম্যান ছিলেন সম্ভবত ঢাকা ইউনিভার্সিটির সমাজ বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টির ডিন ড. আনোয়ার চৌধুরী। তিনি আমাকে বললেন, ইংরেজিতে তো পাচটি সিট ছিল, তা আগেরজনেরা নিয়ে গেছে। তুমি কি নিতে চাও?

আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। হতাশ আমি কি বলবো বুঝতে পারছিলাম না। যখন ইন্টারভিউ থেকে বের হলাম দেখি আমার সাবজেক্ট দেয়া হয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এবং সংযুক্তি জহুরুল হক হল।

জীবনে এই প্রথম বড় ধরনের ধাক্কা খেলাম। বড়ভাইদের কাছে পরামর্শ নিলাম কি করা যায়। তারা বললেন, কোনো ব্যাপার নয়, ভর্তি হয়ে যাও। পরে মাইগ্রেশন করে ইংরেজিতে যাওয়াও যেতে পারে। কিন্তু আমার মন ভেঙে গেল।

খুব বিমর্ষ হয়ে বাসায় ফিরলাম। কি করা যায়! এরই মধ্যে বাসায় দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় দেখতে পেলাম রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ছাত্র রাজনীতির কারণে ফরম বিতরণ বন্ধ হওয়ার পরে আবার ছেড়েছে। কি জন্য যেন ওখানে যেতে মন সায় দিচ্ছিল না। তারপরও সেখানে গেলাম এবং সব ঝেড়েঝুড়ে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে হিসাববিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হলাম।

এদিকে আমার আগের বন্ধুরা যারা কখনোই ক্লাসে রেজাল্টের দিক দিয়ে আমার কাছাকাছি আসতে পারেনি তারা রাজশাহী ইউনিভার্সিটি নিয়ে তাচ্ছিল্য শুরু করলো এবং এক পর্যায়ে আমাকেও ওই একই ব্যবহার দেখালো। কারণ তারা ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র। আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স পাস করে ঢাকা চলে এলাম।

ঢাকা এলাম ১৯৯৭ শেষের দিকে। ঢাকায় আসার পরের অবস্থা আরো করুণ। টিউশনি, চাকরি কোনোটিই আমার হচ্ছিল না। আর্থিক অবস্থা প্রকট আকার ধারণ করলো। পড়াশোনাটাও বিভিন্ন কারণে থেমে গেল।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে দীর্ঘ পাচ বছর পরে ২০০২ সালে প্রথম চাকরি পাই একটি বিদেশি কম্পানিতে। তাও কপালে বেশিদিন সইলো না। ঠুনকো কারণে চাকরিটা চলে গেল।

দুই মাস পরে জয়েন করলাম ভোলা জেলার চরফ্যাশন থানায় অবস্থিত একটি এনজিওতে। সেখানে চাকরি করলাম ছয় মাস। এখানে চাকরি ছাড়ার নয় মাস পরে চাকরি পেলাম বাংলাদেশ সচিবালয়ে। তারপর তো চাকরির বয়সই শেষ।

জীবনের প্রতিটি বাকে বাকে যে ভুলগুলো করেছি, তা না করলে হয়তো জীবনটা অন্য রকম হতো। দীর্ঘ জীবন হতাশার কারণে এখন অন্য রকম হয়ে গেছি। আগের মতো সুন্দর ভাবনাগুলো আর আসে না।

আমার ভাবনাগুলো হিংস্রতা, নৃশংসতা ও নিষিদ্ধতায় ভরা। অথচ কতো কিছু ভেবেছিলাম নিজেকে নিয়ে। ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হবো, বড় কূটনীতিক হবো ইত্যাদি।

এখন আমি সকাল আটটায় অফিসে রওনা হই, বিকাল পাচটায় ফিরি। দিনগুলো যায় স্বপ্নহীন, বর্ণহীনভাবে।

ঝিগাতলা, ঢাকা থেকে

তাহার সনে

– ইব্রাহীম বিন মালেক

গত ঈদের আগের দিন, নিউ মার্কেটে শপিং করছি ঠিক এ সময় দেখলাম এলিনাকে, সঙ্গে তার স্বামী ও ফুটফুটে সুন্দর একটি বাচ্চা। আমি যে দোকান থেকে শপিং করছি তার পাশের দোকানে বাচ্চার জন্য তার স্বামী জামা দেখছেন। তার দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। কিন্তু আমি দেখেও না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে যেতেই সে আমার জামার পেছনে ধরে টান দিল। তার স্বামীও দেখলেন সে আমার জামা ধরে টান দিচ্ছে।

অমনি থেমে গেলাম। হাসি দিয়ে বললাম, কিরে এলি! তুই কোত্থেকে?

হ্যা এখন তো চিনবি না, বড় হয়ে গেছিস, বড় ইউনিভার্সিটিতে পড়িস, বড়দের সঙ্গে মিশিস আমাকে চিনবি কি করে?

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলেই তার স্বামীর সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিতে লাগলো, এই রাসেল, তোমাকে বলেছিলাম না আমার এক সহপাঠী ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। এই সে ইবু, এখন আমাকে চিনতে পারছে না।

বললাম, দেখ এলি, তোকে খেয়াল করিনি।

যাকগে শোন ইবু, এ হচ্ছে আমার বর রাসেল, বিদেশে থাকে আর আমার বাচ্চা তাহসিন। সে আমাকে দেখিয়ে তাহসিনকে বললো, বাবা, তোমার আংকল, সালাম দাও।

এলি, তোর বাচ্চাটা খুব সুন্দর হয়েছে। ঠিক আমার মতো। বেফাস এ কথা বলেই জিভে কামড় দিলাম।

সে আমার পিঠে একটা জোরে কিল দিল।

তার স্বামী এসব খেয়াল করেনি। কারণ তিনি ইতিমধ্যে কেনাকাটায় আবার মন দিয়েছেন।

বললাম, এলি, তোরা শপিং কর, আমার কাজ আছে চলি।

ঠিক এ সময় তার স্বামী আমার হাত ধরলেন। বললেন ভাইজান, আপনি এভাবে চলে যাচ্ছেন, আপনার সঙ্গে তো আলাপই হয়নি, চলেন কোথাও বসি।

আমরা একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম। আলাপচারিতা ভালোই জমে উঠলো।

একবার এলি ও তার স্বামীর দিকে তাকাচ্ছি আবার বাচ্চাটার দিকে তাকাচ্ছি। না! কোথাও মিল নেই। বাচ্চার চেহারার সঙ্গে পিতার চেহারার কোথাও মিল খুজে পেলাম না।

আমার চাহনি দেখে তার স্বামী কিছু না বুঝলেও এলি বুঝেছে, আমি কি চাচ্ছি। বোঝার কারণও আছে।

এলি এবং আমি একই স্কুলে পড়তাম। সে ভালো ছাত্রী ছিল। ক্লাস নাইনে ওঠার পর তার স্মার্টনেস সবার চোখে পড়লো। কথা বলার ধরন এমন ছিল, সবাই তার কথায় আকৃষ্ট হতো। এমনকি আমাদের স্কুলের অনেক স্যারও তার সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করতেন। ক্লাসে এসেই ওনারা প্রথমে তার কাছে পড়া জিজ্ঞাসা করতেন এবং ইনিয়ে-বিনিয়ে তার সঙ্গেই বেশি কথা বলতেন।

ইয়াসমিন, কামরুন, এলি ও আমি আমরা এই চারজন হোসাইন স্যারের কাছে গণিত প্রাইভেট পড়তাম। ক্লাস ছুটির পর স্কুলে আমাদের জন্য একটা রুম বরাদ্দ ছিল, সেখানে স্যার এসে আমাদের পড়াতেন। কোনো কোনোদিন স্যার আসতে দেরি করলে আমরা আড্ডা দিতাম, না হয় লুডু খেলতাম।

খেলাতে এলি সব সময় আমার পার্টনার থাকতো অথবা আড্ডায় সে আমার পাশেই বসতো।

চারজনের মধ্যে তিনজনই মেয়ে এবং আমি ছেলে হওয়ায় ক্লাসের অন্যান্য ছাত্ররা আমাকে লাকি মনে করতো। তারাও প্রাইভেট পড়তো। তবে আমাদের সঙ্গে পড়তো না। কারণ রোল এক থেকে পাচ পর্যন্ত আমাদের ব্যাচটা ছিল স্পেশাল ব্যাচ।

কামরুনের সঙ্গে এলির প্রায় সময় কিছু না কিছু নিয়ে ঝগড়া লেগে থাকতো। একদিন এলিকে কামরু বললো, তুই ইবুর পাশে বসবি না।

অমনি এলি এসে আমার কোলেই বসলো এবং আমাকে বললো, ইবু, তুই পড়ালেখা শেষ করে আমাকেই বিয়ে করবি, দেখি কামরুন মাগিটা কি করে।

এভাবে আমাদের স্কুল জীবন শেষ হয়ে কলেজ জীবনও প্রায় শেষ। এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। এখনো রেজাল্ট বের হয়নি। ঘোষণা হলো ঈদের পরে রেজাল্ট বের হবে। আমরা সবাই মোটামুটি রিলাক্সড মুডে আছি। কারণ পরীক্ষাটা ভালোই হয়েছে।

ঈদের আগের দিন এলি ও ইয়াসমিন আমাকে নিমন্ত্রণ দিল।

আমিও যাবো বলে ওয়াদা করেছি।

ঈদের দিন নামাজ আদায় করে বাসায় এলে মা আমাকে সেমাই ও পায়েস খেতে দিলেন।

বাবা ইতিমধ্যে তার বন্ধুদের সঙ্গে বের হয়েছেন।

মা আমাকে বললেন, ইবু বাবা, তুমি বাসায় থাকো, আমি পাড়া-প্রতিবেশীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্ষুনি আসছি। ঘণ্টা খানেক পরে আর যেতে পারবো না তখন দলে দলে অতিথি আসবে। কেউ এলে তুমি সেমাই ও পায়েস দিও। এই বলে মাও বের হলেন।

একা কিছুক্ষণ বসে থেকে চিন্তা করলাম, সিডি দেখি। সিডি প্লেয়ার অন করলাম। *মন মানে না* সিনেমা শুরু হতে যাচ্ছে ঠিক এ সময় বাসায় এলি এলো। আমি ভূত দেখার মতো চমকে গেলাম। কারণ সে কখনো আমাদের বাসায় আসেনি।

কি ব্যাপারে এলি, তুই এ সময়ে এখানে?

আরে বেটা, ঈদের দিন কারো বাসায় আসতে নিমন্ত্রণ লাগে না। তাই চলে এলাম। আন্টি কই? সে বললো।

আম্মা একটু পাশের বাসায় গেছে, আয় ভেতরে আয়।

সে খাটে বসলো।

ইতিমধ্যে ছবি শুরু হয়ে গেছে।

সে বললো, ইবু, কোন সিনেমা দেখিস রে?

কার নাকি মন মানে না, বললাম। এলি, তোর জন্য সেমাই নিয়ে আসি, তুই বস আর সিনেমা দেখ।

সে তাড়াতাড়ি বললো, না না কিছু আনতে হবে না, আমি এখন খাবো না, আন্টি এলে খেয়ে তোকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাবো। বরং তুইও বস, এক সঙ্গে ছবি দেখি।

মনে মনে খুশিই হলাম। যার জন্য স্কুলের স্যার থেকে শুরু করে পাড়ার অনেকে পাগল সে কি না আমার পাশে বসে সিনেমা দেখছে। বাইরে ইতিমধ্যে তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে এবং আম্মা যে বাসায় গেছেন হয়তো সেখানে আটকা পড়েছেন এবং আমাদের বাসায় কেউ নেই বিধায় আমার সুবিধাই হলো।

তার খুব কাছে খাটের ওপর বসলাম এবং সিনেমা দেখার এক পর্যায়ে তার হাতে হালকা চুমু দিলাম।

সে বললো, ইবু, ভালো হচ্ছে না।

তারপর তার গালে চুমু দিলাম।

এবারও সে বললো, ভালো হচ্ছে না বলছি।

তবে সে আমার পাশেই বসে রইলো।

ভাবলাম, যেহেতু সে আমার পাশ থেকে দূরে যাচ্ছে না সেহেতু সে আনন্দই পাচ্ছে। তাই এবার তার ঠোটে চুমু দিলাম বারকয়েক।

তখন সে আর কিছু বলছে না। আরো সাহসী হলাম এবং তার জামার নিচে বুকে হাত দিলাম।

সে অস্পষ্ট স্বরে বললো, যা দুষ্ট!

ঠোটে গালে, বুকে চুমু দিতে দিতে এক সময় সে উত্তেজিত হয়ে পড়লো এবং সেও আমাকে চুমু দিতে শুরু করলো।

এক সময় দুজনই উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। যখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলাম না তখন তার পায়জামা নিচে নামালাম এবং দুজনেরই উত্তেজনার ইতি টানলাম।

তার সদ্য কেনা ঈদের জামা দলামোচড়া হয়ে একেবারে শেষ আর খাটে বিছানো চাদর যা কি না অতিথিদের জন্য বিছানো হয়েছে তার অবস্থা আরো খারাপ।

তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখলাম তখনো মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।

এলি লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে বসেই রইলো। তাকে সেমাই পায়েস, পানি এনে দিলাম।

বিছানার চাদরটি আবার ইস্ত্রি করে বিছাতে না বিছাতেই আম্মা এসে এলিকে বললো, কি মা, তুমি কখন এলে? এই তো আন্টি কিছুক্ষণ হলো। তারপর সে আম্মাকে বললো, আন্টি, ইবুকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাচ্ছি। সে দুপুরে আমাদের ওখানে খাবে।

ঈদের পনেরো দিন পর এইচএসসি-র রেজাল্ট বের হলো। আমাদের সবার রেজাল্টই খুব ভালো হলো এবং এক মাস পর এলির বিয়ে হলো এক প্রবাসীর সঙ্গে। আমি ঢাকায় কোচিং করতে আসায় তার বিয়েতে যোগ দিতে পারিনি।

নাশতা করে আলাপচারিতার শেষে রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে এলি ও তার স্বামীকে বিদায় জানাতে গিয়ে বাচ্চাটার ওপর আবার চোখ পড়লো এবং মুচকি হেসে আমিও বিদায় নিলাম।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা থেকে

বৃষ্টি

– জুয়েল দেব

ঝিরিঝিরি বানু আমার হাত ধরে টানে। এই ওঠো, বৃষ্টিতে ভিজবো।

বৃষ্টিকে আমার দারুণ ভয়, প্রবল আতঙ্কে রেস্টুরেন্টের অন্ধকার কোনাটার দিকে সেধিয়ে যেতে চাই। কিন্তু ইয়া মোটা ঝিরিঝিরি বানু আমাকে ছাড়বে না।

মিনমিন করি। আমার সাইনোসাইটিসের সমস্যা আছে। একটু ভিজলেই সর্দি, কাশি, ডায়ারিয়া, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু সব হয়ে যাবে।

আমি হচ্ছি সেই ধরনের পাবলিক, যারা বর্ষাকে নিয়ে আবেগ ঘন রোমান্টিক গল্প, কবিতা লিখতে পছন্দ করে, ফলো করে কবিগুরুর সেই বিখ্যাত থিওরি, *ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।*

ঝিরিঝিরিকে কথাটা বলতেই খেকিয়ে ওঠে ও। ওই বুড়োটা নিজে সর্দি জ্বালায় ভিজতে পারতো না বলে অন্যদেরও ভিজতে মানা করেছে। তোমাকে আজ ভিজতে হবেই।

ঝিরিঝিরি বানুর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না, ওর যে শক্তি। তারচেয়ে আপসে আসি। আচ্ছা, তুমি দুই মিনিট অপেক্ষা করো, আমি তিন মিনিটের ভেতর রেইনকোটটা নিয়ে আসছি। রেইনকোট পরে বৃষ্টিতে ভিজবো।

উল্লুক, বেল্লিক, গাধা, রামছাগল, হরিণ, বানর। ঝিরিঝিরি বানুর গালিগুলো আজব কিসিমের।

তারচেয়ে তুমি একটা গান গাও। রাগ থামানোর জন্য বলি।

ঝিরিঝিরি নরম হয়, তারপর গান ধরে, *জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে*।

আমাদের গ্রামের বাড়িতে বিশাল একটা বাশঝাড় আছে। গরমকালে যখন বাশ ফাটে তখন ধাস ধাস যে আওয়াজ হয়, এখন ঝিরিঝিরি বানুর গলা দিয়ে সে রকম আওয়াজ বের হচ্ছে।

তাড়াতাড়ি কানে হাতচাপা দিয়ে বলি, জ্যোৎস্না নয়, তুমি বরং বর্ষার গান গাও। আমি ততোক্ষণে টয়লেট থেকে আসি। লোকজন যেভাবে এদিকে তাকাচ্ছে তাতে ঝিরিঝিরিকে গান গাইতে উৎসাহিত করার জন্য না জানি আমাকেই ধরে প্যাদানি দেয়।

টয়লেটের নাম করে আমি সোজা বাসায়।

পরে মোবাইলে ঝিরিঝিরির খবর নিই। ওইদিন গান শুনে তাকে নাকি সবাই *তোমাকে খুজছে বাংলাদেশ* প্রতিযোগিতায় নিজেদের টাকা খরচ করে নাম লিখিয়ে দিয়েছে।

কে বলেছে, *বাঙালি প্রতিভার কদর করে না*।

বাড়ি থেকে মায়ের চিঠি এসেছে। কড়া আদেশ, গ্রামে যেতে হবে। এ বছরের বর্ষা দেখতে হবে। লিখেছেন, শহরে বৃষ্টিতে ভেজার স্পেস কোথায়। সবই তো নেতারা দখল করে রেখেছে। তারচেয়ে তুমি গ্রামে চলে এসো। কয়েকদিন বৃষ্টিতে ভিজে যাও।

যেখানেই বাঘের ভয় সেখানেই মাঝরাত। বাড়ি না গিয়েও উপায় নেই। মা তাহলে মাসিক হাত খরচের টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেবেন। অগত্যা বাসে চেপে বসি।

এদিকে অর্ধেক পথ আসতে বন্ধ বাসের ভেতর মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে আমার। মনে হচ্ছে বমি হবে। জানালা খুলে বাইরে মাথা বের করবো সে উপায়ও নেই। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। শেষে নিজের গায়ের ওপরই ঝেড়ে দিই।

লোকজন দেখি নাক কুচকাচ্ছে। ওরা সংগঠিত হচ্ছে। একজন ঝাড়ি হাকায়, ওই মিয়া বাস থিকা নামেন, গন্ধে তো পুরা আমেরিকা বানাইছেন। বৃষ্টিতে ভিজে পাকসাফ হয়ে আসেন।

আরেকজন চিল্লায়, ওই কন্ডাক্টর, এই ব্যাডারে নাকে ধইরা নামিয়ে দেও।

বাব্বা, এদের মাথায় তো দেখি বেশ নতুন নতুন আইডিয়া খেলা করে। ঘাড় ধরে কিংবা কান ধরে নামানোর কথা শুনেছি। কিন্তু নাক ধরার কথা এই প্রথম শুনলাম। ভদ্রলোকদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথাটা নুয়ে আসে। আহা! আইডিয়ার অভাবেই তো আমরা দুর্নীতিতে চারবার চ্যাম্পিয়ন, থুড়ি, উন্নতি করতে পারছি না। ইচ্ছা করছে ওদের একটা গ্রুপ ফটো নিয়ে বাধাই করে আমাদের ড্রয়িংরুমে ঝুলিয়ে রাখতে।

কন্ডাক্টর ব্যাটা নাকে ধরেই নামিয়ে দিল। কথামতো কাজ করার লোক বিরল। কন্ডাক্টরকে একটা সালাম করতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু ততোক্ষণে বাসটা চলে গেছে।

যাক, পরে কোনোদিন দেখা হলে সালাম করে নেবো। বলতে ভুলে গেছি, কন্ডাক্টর তার নাকটাই ধরে ছিল। যে গন্ধ, নাক না ধরলে ওর নির্ঘাত ডায়াবেটিস হয়ে যেতো।

একটা রিকশায় উঠে বসি। আধ ঘণ্টাখানেক লাগবে বাড়ি পৌছাতে। বৃষ্টিটা আবার ডিস্টার্ব করছে। কিছুদূর আসতেই রিকশাচালক রিকশা থেকে নেমে পাশের ধান ক্ষেতের দিকে দৌড় মারলো। ভাবলাম, ওর বুঝি বৃষ্টিতে ভেজার শখ হয়েছে। কিন্তু এতোক্ষণ তো ভিজতে ভিজতে রিকশা চালাচ্ছিল, আবার নতুন করে ভিজবে কিভাবে?

রিকশাচালক ফিরে আসতেই তাকে শুধালাম, কি ভাই, বৃষ্টিতে ভিজতে গিয়েছিলেন বুঝি, যা সুন্দর বৃষ্টি পড়ছে, কার মনকে ধরে রাখা যায় বলেন, সবারই ভিজতে ইচ্ছা হবে।

রিকশাচালক কেমন যেন উদাস চোখে তাকায়। *ঠিকই কইছেন, ধইরা রাখন যায় না কইলেন, পেড্ডা এমন মোচড় মাইরা উঠলো, ধইরা রাখতে পারলাম না, ধান ক্ষেতে গিয়া হাইগা আসলাম।*

ব্যাটা অসভ্য, বজ্জাত, কেউ এসব কথা এভাবে ওপেনলি বলে?

এক জায়গায় এসে দেখি রাস্তা ভাঙা, নামতে হবে। নেমেই দেখি, রাস্তার মাঝখানে কে যেন হেগে রেখেছে। অন্যদিকে তাকিয়ে নাকে হাত চাপা দিয়ে দৌড় মারি। রাস্তাটা পেরিয়ে এসে অপর পাশে দাড়াই। কোথা থেকে জানি বদ খশবু আসছে। হারামজাদা রিকশাচালক এখানেই বদ কাজটা সেরে গিয়েছে কি না কে জানে। রিকশায় উঠতে যাবো, রিকশাচালক বাধা দিল। *ছার আপনে আর আমার রিকশায় উঠবেন না, নাপাক হয়া গ্যাছেন।*

ব্যাটা অসভ্য, বলে গালি দিতে চাইলাম। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি ওই বস্তুতে পুরো পা মাখামাখি। হেটেই বাড়ি পৌছাতে হবে। বৃষ্টিটা আবার এসেছে।

বিকেলে ঘুরতে বেড়িয়েছি। দেখি পাড়ার আণ্ডা-বাচ্চাগুলো সব আমার পেছনে পেছনে ঘুরছে। কি ব্যাপার, সালমান খান-টান মনে করলো নাকি! এক বুড়োকে শুধালাম, কি ব্যাপার চাচা, সবাই আমার পেছনে ঘুরছে কেন?

বুড়ো দাত কেলিয়ে হাসলেন। *ছার, গরিব পোলাপান, চিড়িয়াখানায় গিয়া তো আর বান্দর দ্যাখতে পারবো না। হের লিগ্যা আফনের পিছে পিছে ঘুরতাছে। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটান আর কি!*

ব্যাটা বেল্লিক আমার চেহারা বান্দরের মতো? তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। বলা যায় না, গ্রামের লোক খাচায় ভরে দুই টাকা টিকেটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারে।

ঘরে আসতেই মা এসে কথাটা পাড়লেন। তোর জন্য একটা মেয়ে দেখেছি, আমার খুব পছন্দ, তোকে দেখানোর জন্য খবর দিয়ে আনলাম।

মাও তো দেখি র‍্যাবের কায়দা অনুসরণ করছেন। অস্ত্র উদ্ধারের নাম করে বিয়ে করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা, বাহ! ভালোই তো। মা রাজনীতি শিখে যাচ্ছেন। আগামীবারে ইউপি নির্বাচনে মহিলা মেম্বার পদে দাড় করিয়ে দেবো। তারপর স্লোগান দেবো, *আমার বোন, তোমার বোন,* মানে ওই সময় সব প্রার্থীই ভাইবোন হয়ে যায় কি না!

মাকে শুধাই, মেয়ের নাম কি?

বৃষ্টি। মা উদাস স্বরে বলেন পান চিবাতে চিবাতে।

কল্পনায় দেখতে পেলাম, বৃষ্টিতে ভিজে বাধানো সর্দি বৌয়ের শাড়ির আচলে মুছে দিতে বৌ আমাকে রুটি বেলার বেলুন দিয়ে তাড়া করছে।

মা, আমি আসছি বলে এক কাপড়ে বাড়ি থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসতে গিয়ে কিসে যেন পিছলে গেলাম। দেখি ওঠানে কোনো এক বাচ্চা হেগে রেখেছে। আর আমি পপাত ধরণিতল সেই বস্তুতে পা দিয়েই।

বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি থেকে

পরিস্থিতি

– একেএম আহসান উল্লাহ

কাকের ঘুম ভেঙেছে মাত্র। শাহবাগ হয়ে মোহাম্মদপুর, মিরপুরের বাসগুলো গুলিস্তানের দিকে দৌড়াচ্ছে। তিনশ সাতাশ নাম্বার রুমের ফয়েজ এখনো টেবিল লাইট জ্বালিয়ে পড়ছে। সকালে ওর ইনকোর্স পরীক্ষা।

তার ওপর টিউশনি থেকে ফিরে সন্ধ্যায় মিছিলে যেতে হয়েছে। তিনশ উনত্রিশ নাম্বার রুমের এনায়েতভাই ও রুমমেট আশরাফ লেপের মধ্যে আড়মোড়া দিচ্ছে। *আসসালাতু খাইরুমমিনান নাউম* ধ্বনি তাদের কানে ঢুকছে। জানালায় নুয়ে পড়া কদম গাছের শিশির ভেজা পাতা দোল খাচ্ছে। কুয়াশায় আচ্ছন্ন চারদিক।

এক রুমে সাতজন আমরা। রুমমেট আক্তার লেপের ভেতর হাত ঢুকিয়ে পা ধরে টান দিয়ে চিৎকার করে – ওঠেন ভাই ওঠেন, হল দখল হয়েছে।

হল তো দখল হয়েই আছে আবার নতুন করে দখল হওয়ার কি আছে? লেপ টেনে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করি। দক্ষিণ ব্লক থেকে চুপ চুপ শব্দ শুনে মাথার ওপর থেকে লেপটা আবার সরাই।

ধপ!

ওরে মাগোরে, বাবারে, বাচাও বাচাও।

বাচাবে কে, কাকপক্ষী? ফিরে দেখি রুমের সবাই জানালার ফাক দিয়ে বাচাও বাচাও দৃশ্য দেখছে।

শামিল হলাম তাদের সঙ্গে। দক্ষিণ ব্লকের দোতলা থেকে তিন চারজন এই ব্লকের দিকে বন্দুক তাক করে – *ওই শালারা চুপ, কোনো শব্দ করলে মাথার খুলি উড়াইয়া দিমু।*

দুই হাত দিয়ে মাথাটাকে শক্ত করে চেপে ধরে মেঝেতে বসে পড়ি। অস্ফুট স্বরে এখনো এক আহতের জীবন ভিক্ষার আকুতি শোনা যাচ্ছে।

মাথার খুলির দাম অনেক। জাহাঙ্গীরভাই মুখে কুলুপ এটে তার মাঝ বরাবর তর্জনি চেপে ধরেন। আঙুল সরিয়ে মাঝে মধ্যে ইংরেজিতে বকে যাচ্ছেন। সাইলেন্স, নো টক, দে কিল আস, দে অ্যাটাক আস, ভেরি ব্যাড, দে আর নট স্টুডেন্টস!

নানান রকমের ইংরেজি ডিকশনারি দিয়ে তার টেবিল সাজিয়ে রাখেন আর সারা দিন ওতেই মুখ বুজে বসে থাকেন। কোনোভাবেই বোঝার উপায় নেই তিনি বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। শোনা গেছে, নীলক্ষেতে যেতে তিনি রিকশাচালকদের বলতেন, গো টু ব্লুল্যান্ড।

কিছুক্ষণ পর তিনি মাথা তুলে বললেন, নাউ নো ডেনজার।

আমরা বারান্দায় বেরিয়ে আসি।

নগ্ন বিশাল দেহ। উপুড় হয়ে পড়ে আছে। নিথর। রক্ত ঝরছে। বারান্দায় দাড়িয়ে তা দেখছে শ শ ছাত্র। তিনি ছাত্রনেতা। ওই ব্লকে সিঙ্গল সিটে থাকেন। একই দল, উপদল, ভেতরে কোন্দল। একদল তার হাত পায়ের রগ কেটে দেয়। তাকে ন্যাংটা করে দোতলা থেকে ফেলে দেয়। আর এ দৃশ্যই আমাদের সামনে।

এখন আর প্রতিনিয়ত সান্ধ্যকালীন মিছিলে যেতে ভুলি না কিংবা পালিয়েও থাকি না। ... লও লও লও সালাম... তোমার নেতা আমার নেতা ...।

থাক পরীক্ষা। জীবনের দাম অনেক। মফস্বল থেকে আসা এ আমাদের মেনে নিতে হবে। যুদ্ধ যুদ্ধই।

রুমমেট আক্তার। নেতাদের সঙ্গে ওঠা–বসা করে। তাই কেউ–ই পাত্তা পায় না আক্তারের কাছে। রুমের সবচেয়ে জুনিয়র সে। সিনিয়র ছাত্রদের চড়–থাপ্পড় মারা, ডাইনিংয়ে প্লেট–গ্লাস ভাঙা আক্তারের প্রিয় কাজগুলোর অন্যতম। হোক জুনিয়র বা সিনিয়র। কিচ্ছু এসে যায় না।

মিছিল–টিছিল শেষ করে ডাইনিংয়ে খেয়ে টেবিলে বসা। খামাখাই বসা। বসতে বসতে রাত এগারো বারো আর তখনই আক্তার গর্ভবতী কুকুরের মত একটা শব্দ করা শুরু করে। ও এই শব্দটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা করতে পারে অতি উচু ভলিউমে। কিভাবে আয়ত্ত্ব করেছে জানি না। কে ঘুমাচ্ছে কে পড়ছে কার সকালে পরীক্ষা কে অসুস্থ তা আক্তারের দেখার বিষয় নয়।

একদিন আক্তারকে ডেকে বললাম, তুমি ইউনিভার্সিটির ছাত্র, তোমার একটা ব্যক্তিত্ব আছে। তুমি যে শব্দটা করো তা শুনতে ভালো শোনায় না।

ছাত্রদের সমস্যা হয় তা আর বললাম না।

ও কিছু না বলে চলে যায় ওর কাজে। বোঝা যায় ও আমার সাহস দেখে বিস্মিত। আমি দুই বছরের সিনিয়র। তাই হয়তো গায়ে হাত তুলতে পারে না। তবে মাঝে মধ্যে *ঝিকে মেরে বৌকে শাসায়*।

পরদিন ক্লাস থেকে হলে ফেরার পথে দেখি এক জটলা ছাত্রের মাঝে আক্তার। আমাকে ইংগিত করে সবাইকে বলছে, *ব্যক্তিত্ব* যাচ্ছে। হাঃ হাঃ, হোঃ হোঃ, হিঃ হিঃ।

আমার অসহায়ত্ব সবাই তাকিয়ে দেখে। সেই যে গর্ভবতী জন্তুটার চিৎকারের উদাহরণ টেনেছিলাম সেই চিৎকার তো থামলোই না, বরং এর সঙ্গে যুক্ত হলো *ব্যক্তিত্ব* শব্দটি।

দুর্ব্যবহার দিন দিন শুধু বেড়েই চলে। যন্ত্রণায় ছটফট করি। কুকুরের চিৎকারই তো ভালো ছিল। আমার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখখানি দেখে এনামের মায়া হয়, আশরাফের মায়া হয়, জাহাঙ্গীরভাই, মুজিবভাই সবার মায়া হয়। কারো কিছু করার থাকে না। অপরাধ যে করে, মাশুল তাকেই গুণতে হয়, এটাই রীতি।

আশরাফ একদিন ডেকে বলে, তেমার সামনে ফাইনাল পরীক্ষা। যেভাবে দিন যাচ্ছে এতে তোমার পড়ালেখা কিচ্ছু হবে না। আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যাও। অন্তত পরীক্ষার আগ পর্যন্ত থেকে আসো। কতো সাদাসিধাভাবে আশরাফ বলে যায় কথাগুলো।

আমার ইচ্ছা হয় কোথাও গিয়ে কয়েকটা দিন পড়ালেখা করে আসি যেখানে আক্তাররা থাকে না।

যে অজুহাত দেখিয়ে হলেই থেকে যাই তা একদম পঙ্গু। সেটা আশরাফ ভালো করেই জানে। তারপর এলিফ্যান্ট রোডের মেস, তোপখানা রোডের মেস এবং ফকিরের পুলের মেস। যন্ত্রণাভরা দিনগুলো থেকে মুক্তির সন্ধানে মেস থেকে মেসান্তরে।

কয়েক বছর পরের কথা।

শুনেছি আক্তার আর আগের মতো চিৎকার করে না, ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্ব বলে হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ করে না। নেতাদের পেছন পেছন ঘোরে না।

আমার অফিস মহাখালিতে। সকাল সাড়ে আটটা থেকে বিকাল পাচটা পর্যন্ত অফিস সময়। ডেস্কে এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা, *আপনার ভিজিটর আছে*।

সোফায় বসা অতি পরিচিত একটা নত মুখ। কাছে বসলাম। সরে গিয়ে জায়গা দিল।

বললাম, জায়গা তো আছেই, বসো। ও চাকরি খুজছে। একটা চাকরি ওর খুব দরকার। অনেক চেষ্টার করেও হয়ে উঠছে না।

সেই একই প্যান্ট, একই জুতা, একই জামা, ধূসর হয়ে গেছে সব। আমারও বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না চাকরিটা ওর কতো প্রয়োজন। ওর মুখ, ওর বসা, ওর কথা, ওর কণ্ঠস্বর, বিনয় দেখে। ওর প্রকৃত অবস্থাটা হয়তো উপলব্ধি করা যায়।

তবে জানি না কোন পরিস্থিতি আক্তারকে আমার কাছে আসতে বাধ্য করেছে।

হং কং থেকে

akmashsanullah@gmail.com

দ্বিতীয় কান্না

– রফিকুন্নেসা হুদা

গত কয়েকদিন ধরে বুলার ঘুম হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না সে তাও জানে না। কিন্তু বোঝে। না জেনে বোঝাটা ঠিক নয়। চেষ্টা করছে মন থেকে অহেতুক ভাবনা দূর করতে। পারছে না।

নতুন সংসার। মাত্র সাত মাস দশ দিনের সংসার। সুপুরুষ স্বামী। তার পছন্দ মতোই বিয়ে হয়েছে সামান্য পরিচয়ে। সবাই জানে ভালো। কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, হাস্যরসিক স্বামী মুন্নাকে নিয়ে সে তো ভালোই ছিল, তৃপ্ত সুখী। তবে কেন এমন হলো?

বুলা মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দেয়, কেন সে এতো নিচু চিন্তাধারা নিয়ে মন খারাপ করছে। যতো কিছুতেই সে নিজের মনকে প্রবোধ দিক না কেন, একটা বোবা কান্না কিছুতেই দমন করতে পারছে না। তার যে কান্নায় বুক ফেটে যাচ্ছে। একটা সূক্ষ্ম, অথচ তীব্র বেদনা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ভীষণ কাদতে ইচ্ছা করছে। গোসল করতে গিয়ে বাথরুমের শাওয়ার খুলে পানির ট্যাপ জোরে ছেড়ে দিয়ে পানির শব্দের মধ্যে সে চিৎকার করে কেদে মনটা হালকা করে।

পানির শব্দে তার কান্নার শব্দ শোনা যায় না। গোসল শেষ করে লাল চোখ নিয়ে সে বের হয়। একটু হালকা মনে হচ্ছে নিজেকে।

ঈদের মাত্র দুই দিন বাকি। সব কেনাকাটা শেষ। বুলাই উদ্যোগ নিয়ে সবার জন্য কেনাকাটা করেছে। এমনকি মুনার জন্যও একটা চমৎকার পাঞ্জাবি কিনেছে। শাশুড়ি, ননদ, বাচ্চা সবার জন্য। বাসার কাজের লোকদের জন্যও। অথচ নিজের জন্য কিছুই করেনি।

আশ্চর্য! কেউ একবার জানতেও চাইলো না তার কিছু লাগবে কি না বা সে কিছু কিনবে কি না। নতুন বৌ, সবাই জানতে চাইবে বিয়ের পর প্রথম ঈদে তাকে কি দেয়া হয়েছে। মাত্র একটা শাড়িই তো।

দোকানে সবার জন্য কেনাকাটার সময় একটা শাড়ি তার খুব পছন্দ হয়েছিল। মুন্নাকে সে বলেছিল শাড়িটা খুব সুন্দর, তাই না?

মুন্না কোনো জবাব দেয়নি, কেবল একবার তাকিয়েছিল।

মুন্না এতো নির্লিপ্ত কেন? শাশুড়ি ননদ তারাও তো কেউ কিছু বললো না, এমনকি এসব কেনাকাটার মধ্যে তার নামটাও কেউ উচ্চারণ করছে না। অথচ সেই তো সবাইকে সঙ্গে নিয়ে লিস্ট করে করে সব কিছু করছে।

হঠাৎ করে কেমন যেন নিজেকে খুব অপাংক্তেয় মনে হলো বুলার। তাই বা কি করে হয়!

ঈদের দিন বাসায় মোটামুটি বেশ ভালোই আয়োজন হচ্ছে। বিয়ের পর মুন্নার প্রথম ঈদে তার শশুর বাড়ির সবাইকে, বাপের বাড়ির ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং নিজের ও বুলার কয়েকজন বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান হচ্ছে।

বুলা আর ভাবতে পারে না। তার জন্য কিছুই কেনা হলো না। সবাই যখন জানতে চাইবে ঈদে কি দিয়েছে বৌকে তখন কি বলবে বুলা?

মনে মনে ঠিক করে রাখে বুলা, তার তো অনেক শাড়ি, দুটা বের করে রাখবে, তাই দেখাবে।

ঈদের চাদ উঠেছে। সবাই খুব হই চই করছে। টেলিভিশনে গান হচ্ছে *রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ*।

নিজেকে খুব শক্ত রাখার চেষ্টা করছে, কি হবে কিছু না কিনলে।

পাশের ঘরে বাচ্চাদের হই চই। শাশুড়ি ননদরা গল্প করছেন। ঘরে একটা উৎসব উৎসব ভাব।

নির্লিপ্ত বুলা শুয়ে শুয়ে একটা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিল। মুন্না এখনো ফেরেনি, কি মিটিং আছে অফিসের পরে। তাই ফিরতে দেরি হবে জানিয়েছে।

অন্যমনস্ক বুলা কলিংবেলের শব্দ আর বাইরে গাড়ির শব্দে সচকিত হলো। মুন্না এসেছে। এবারে সে বেশ সহজ হওয়ার চেষ্টা করে। শক্ত হবে, কিছুতেই যেন মুন্না বুঝতে না পারে তার মন খারাপ।

ননদ দরজা খুলতেই কল কল শব্দে ঘরে ঢুকলো বুলার ছোট দুই বোন আর ভাই। চিৎকার ঘরে ঢুকেই ডাকতে লাগলো, বুবু তুমি কোথায়, দেখো আমরা এসে গেছি।

বোনদের কথা শুনে প্রচণ্ড কান্না দমন করে এগিয়ে গেল সে।

কিন্তু একি! মুন্না মিটিংয়ের কথা বলে ওদের বাসায় গিয়ে এদের নিয়ে এসেছে। শুধু তাই নয়, বিস্তর কেনাকাটা করেছে বুলার জন্য।

একটা প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বললো, দেখো তো পছন্দ হয় কি না?

বুলা বিশ্বাস করতে পারছে না এসব কি সত্যি, না স্বপ্ন।

এগিয়ে এলো শাশুড়ি, ননদ সবাই একটা করে প্যাকেট নিয়ে।

বাচ্চারাও টুকটাক জিনিস এবং ফুল দিয়ে ঈদ মোবারক জানালো। বুলার বোনরাও ওকে শাড়ি এবং অন্য জিনিসপত্র দিল।

মুন্না বললো, কি ব্যাপার, তুমি চুপ করে আছে কেন, শাড়ির প্যাকেট খোলো, কি পছন্দ হয়নি?

বুলার ননদ শাড়ির প্যাকেটা খুলতেই বুলা তো অবাক, আরে এতো সেই শাড়ি যেটা সে দোকানে পছন্দ করেছিল।

এবার বুলার আবারও প্রচণ্ড কান্না পেল। দুঃখের নয়, খুশির। কান্নার জন্য তো আবার বাথরুমে যেতে হবে। বুঝতে পারলো তার সঙ্গে একটু মজা করার জন্যই এসব পূর্ব পরিকল্পিত অভিনয়। কি চমৎকার অভিনয়!

মহাখালী, ঢাকা থেকে